উৎপাদন ও উৎপাদনের উপকরণ

ইউনিট ৮

ভূমিকা

আগের পাঠসমূহে আমরা চাহিদা, যোগান ও দাম নির্ধারণ নিয়ে যে আলোচনা করেছি তা বস্তুতঃ উৎপাদনকে নিয়ে। মানুষের নানান ধরনের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যেই অসংখ্য পণ্য উৎপাদন ও সেবাকর্মের যোগান দেয়। একটি দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ বিচার করা হয় তার উৎপাদনের ক্ষমতার উপর অর্থাৎ ঐ দেশের জ্ঞান, প্রতিষ্ঠান এবং মূলধনকে কাজে লাগিয়ে কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনে সক্ষম তার উপর নির্ভর করে। আধুনিক শিল্পোন্নত দেশসমূহে জনগণের জীবনের মান উঁচু এজন্য যে সেখানে শ্রমিকের গড় পড়তা উৎপাদন অনেক বেশি (উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা ধারণাটি দ্রষ্টব্য)।

পাঠ ১ : উৎপাদন : উপকরণ ও শ্রেণী বিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- উৎপাদন কি তা বলতে পারবেন।
- উপযোগের শ্রেণী বিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

উৎপাদন কাকে বলে ?

আপনি একটি চেয়ারে বসে পড়াশুনা করেন। প্রকৃতিতে তৈরি অবস্থায় চেয়ারটি পাওয়া যায় না। গাছ কেটে, প্রয়োজনমত চিরে, কাঠমিস্ত্রির সহায়তায় এটি তৈরি করতে হয়েছে। প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত গাছ থেকে সংগৃহীত কাঠের ধরন পরিবর্তন করে চেয়ার উৎপাদন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষ কোন পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে না। যদিও সাধারণতঃ উৎপাদন বলতে কোন দ্রব্য সৃষ্টি করা বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে উৎপাদন শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন বলতে অর্থনীতিতে উপযোগ সৃষ্টি বুঝায়। বস্তুতঃ মানুষ কোন পদার্থ সৃষ্টি করতে পারেনা, ধ্বংসও করতে পারে না। মানুষ শুধু প্রকৃতি প্রদত্ত কোন বস্তু বা পদার্থের রূপান্তর বা আকারগত পরিবর্তন ঘটিয়ে উপযোগ সৃষ্টি বা বৃদ্ধি করতে পারে। অধ্যাপক মার্শাল বলেন, "এই বস্তুজগতে মানুষ যাহা করিতে পারে তা শুধু এই যে, সে বস্তুকে অধিকতর কার্যোপযোগী করিবার জন্য উহার পুনর্বিন্যাস করিতে পারে কিংবা বস্তুকে এমনভাবে স্থাপন করিতে পারে যাহাতে প্রকৃতি উহাকে অধিকতর কার্যোপযোগী করিয়া তোলে।" যেমন কৃষক বীজ হতে ফসল উৎপাদন করে; তাঁতী তুলা হতে কাপড় উৎপাদন করে। এ সকল দ্রব্যের বেশীরভাগ প্রকৃতির দান। মানুষ নিজের শ্রম, মেধা ও পুঁজি কাজে লাগিয়ে প্রকৃতি প্রদত্ত বস্তুকে অধিকতর উপযোগী করে তোলে। তাই উৎপাদন মানে উপযোগ বা কাম্যতা সৃষ্টি। অন্যকথায় উৎপাদন মানে হচ্ছে,

দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য সৃষ্টি করা। উপযোগ সৃষ্টি বিভিন্ন ধরনের হতে পরে। তুলাকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে কাপড়ের কল যে রঙিন শাড়ী তৈরি করে তার মূল্য তুলার মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি। এভাবে তুলার মূল্যের সাথে শাড়ীর মূল্য সংযোজিত হয়ে অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে লোহার টিনের সিট থেকে শিল্প শ্রমিক আলমারি তৈরি করে, কৃষক জমিতে আধুনিক উপকরণ (পানি সেচ ব্যবস্থা, সার, উফসী বীজ ইত্যাদি) ব্যবহার করে অধিক কৃষিপণ্য উৎপন্ন করে, শিক্ষক শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানুষকে উন্নত জীবনের পথ নির্দেশ করে। এগুলো সবই উৎপাদনের কাজ।

উপযোগের শ্রেণীবিভাগ

মানুষ প্রধানত প্রকৃতি-প্রদত্ত পদার্থের আকার, স্থান, সময় ও মালিকানা পরিবর্তন ঘটিয়ে উপযোগ সৃষ্টি করে। তাই উপযোগকে প্রধানতঃ চারভাগে ভাগ করা হয়। যথা (১) রূপগত উপযোগ, (২) স্থানগত উপযোগ, (৩) সময় বা কালগত উপযোগ এবং (৪) হস্তান্তরযোগ্য উপযোগ।

১. **রূপগত উপযোগ :** প্রকৃতি প্রদত্ত কোন বস্তুর রূপ বা আকার পরিবর্তন করে যে উপযোগ সৃষ্টি করা হয় তাকে রূপগত উপযোগ বলা হয়। যেমন, কাঠের রূপ বা আকৃতি পরিবর্তন করে চেয়ার বা আসবাবপত্র তৈরি, তুলার রূপ পরিবর্তন করে কাপড় তৈরি করাকে রূপগত উপযোগ সৃষ্টি বলা হয়।

২. **স্থানগত উপযোগ :** কোন দ্রব্যকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করে উপযোগ সৃষ্টি করা যায়। একে স্থানগত উপযোগ বলা হয়। যেমন, গ্রামাঞ্চল থেকে শাকসব্জি শহরে এনে এর উপযোগ সৃষ্টি বা বৃদ্ধি করা যায়। নদী থেকে মাছ শহরের বাজারে আনলে বেশি দামে বিক্রি হয়।

৩. **সময় বা কালগত উপযোগ :** কোন কোন দ্রব্যের উপযোগ সময়ের ব্যবধানের জন্য বিভিন্ন হয়ে থাকে। কোন দ্রব্য উৎপাদনের পর কিছুকাল মজুদ রাখলে উপযোগ বৃদ্ধি পায়। এরূপ উপযোগকে সময়গত বা কালগত উপযোগ বলে যেমন, ফসল কাটার পর কিছুকাল সংরক্ষণের পর বিক্রি করলে বেশি মূল্য পাওয়া যায়।

৪. **হস্তান্তরযোগ্য বা মালিকানার উপযোগ:** কোন এক ব্যক্তির কাছে কোন পণ্যের উপযোগ কম, অথচ ঐ পণ্যটির উপযোগ আরেক ব্যক্তির কাছে বেশি। এমতবস্থায়, পণ্যটি হস্তান্তর হলে উপযোগ বৃদ্ধি পায়। যেমন-গৃহস্থের বাড়ীতে নারিকেলের ছোবড়ার তেমন মূল্য নেই, কিন্তু ছোবড়া শিল্পের মালিকের কাছে এর মূল্য অনেক বেশি।

পণ্যের উৎপাদনের আলোচনার সঙ্গে সেবা কর্মের সৃষ্টি ও বৃদ্ধির আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত। মানুষ তার শ্রম ও সেবা কর্মের দ্বারা যে উপযোগ বৃদ্ধি বা সৃষ্টি করে তাকে সেবাগত উপযোগ বলে।

উৎপাদনের উপাদান

কোন কিছু উৎপাদনের জন্য যে সকল বস্তু বা সেবাকর্ম প্রয়োজন হয় ঐগুলিকে উৎপাদনের উপাদান বলা হয়। এগুলি হল ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। যেমন-ধান উৎপাদন করতে হলে শুধু ভূমি হলেই চলবে না, অন্য তিনটি উপাদানেরও প্রয়োজন হয়। তেমনি শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে কেবলমাত্র কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি থাকলেই হবে না, একই সঙ্গে ভূমি, শ্রম, নগদ টাকা ও সংগঠন আবশ্যক। অবশ্য আধুনিককালে উপাদান হিসেবে শ্রমের সংগে সংগঠনকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নিম্নে উৎপাদনের উপাদানসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

১. **ভূমি :** সাধারণতঃ পৃথিবীর উপরিভাগকে ভূমি বলা হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে ভূমি বলতে শুধু ভূ-পৃষ্ঠকেই বুঝায় না, বরং প্রাকৃতিক সকল সম্পদকে বুঝায়। অর্থাৎ মাটির উর্বরাশক্তি, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, তাপ, জল, বাতাস, সূর্যের আলো, খনিজ সম্পদ, বন, মৎস্যক্ষেত্র, খাল-বিল, নদ-নদী, সমুদ্র প্রভৃতি যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমির অন্তর্গত। এ সমস্ত কিছুই প্রকৃতির দান। ইহা উৎপাদনের একটি আদি ও মৌলিক উপাদান।

২. **শ্রম :** উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে। শ্রমের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে সেগুলিকে ব্যবহারের জন্য আরো উপযোগী করে তোলে। শ্রমও উৎপাদনের একটি আদি ও অপরিহার্য উপাদান। স্যার উইলিয়াম পেটি (Sir Willian Petty) বিষয়টিকে আকর্ষণীয়ভাবে বর্ণনা করে বলেছেন, “ উৎপাদনের শ্রমিক হল পিতা এবং ভূমি হল মাতা।’

৩. **মূলধন :** মানুষের শ্রম দ্বারা উৎপাদিত হয়ে যে বস্তু সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত না হয়ে পুনরায় উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাকে মূলধন বলে। যেমন, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, ঘর,বাড়ী, কলকারখানা প্রভৃতি মানুষের উৎপাদিত দ্রব্য যা উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে মূলধন বলা হয়।

৪ **সংগঠন :** আধুনিককালে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে একত্রিত করে এগুলিকে উৎপাদন কার্যে নিয়োগ করার উদ্যোগকে সংগঠন বলে। উৎপাদন পদ্ধতির জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সংগঠনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই দক্ষ সংগঠনের প্রয়োজন বেড়ে চলছে। যারা একাজ করে তাদেরকে উদ্যোক্তা বা সংগঠক বলে। সংগঠককে উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়, পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হয় এবং ব্যবসায়ের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করতে হয়।

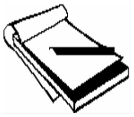

অনুশীলনী ৮.১

১. উৎপাদন কাকে বলে? উৎপাদনের উপকরণসমূহ কি কি? বর্ণনা করুন।

পাঠ ২ : ভূমির বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ভূমি কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- ভূমির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- উৎপাদনে ভূমির ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ভূমির সংজ্ঞা

উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হল ভূমি। সাধারণ অর্থে ভূমি বলতে মৃত্তিকা বা ভূ-ত্বক বা ভূ-পৃষ্ঠকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে 'ভূমি' ধারণাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে ভূমি বলতে উৎপাদনের সহায়ক সকল প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদকে বুঝায়। পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ, জল-স্থল, আলো-বাতাস, বৃষ্টিপাত, মাটির উর্বরা শক্তি, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, খনিজ দ্রব্য, খাল-বিল প্রভৃতি সকল প্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমির অন্তর্ভুক্ত। মানুষ এগুলি সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং উৎপাদন কার্যে সহায়ক প্রাকৃতিক সকল সম্পদকে অর্থনীতিতে 'ভূমি' বলে।

ভূমির বৈশিষ্ট্য

ভূমি উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান থেকে ভিন্ন। ভূমির বৈশিষ্ট্যসমূহই একে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানসমূহ থেকে পৃথক করে রেখেছে। নিম্নে ভূমির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল :

১. **ভূমি প্রকৃতির দান :** ভূমি প্রকৃতির দান, মানুষ ভূমি সৃষ্টি করেনি। এর কোন উৎপাদন খরচ বা দাম যোগান নেই। ফলে ভূমি সৃষ্টির জন্য মূলতঃ কোন প্রচেষ্টা বা ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। তবে এ ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। কারণ বন কেটে বসতি বা মরুভূমিতে জলসেচ করে বা সমুদ্র উপকূলে বাঁধ দিয়ে জমি উদ্ধার প্রভৃতি কাজে যে সফলতা অর্জিত হচ্ছে এটি অবশ্যই মানুষের চেষ্টার দান এবং এর যোগান দামও আছে। কিন্তু এরূপ প্রয়াস খুবই সীমিত। এজন্যই স্বল্পকালীন ভিত্তিতে জমির যোগান সীমাবদ্ধ ধরা হয়। আবার অনেক জমিকে চাষযোগ্য বা উর্বরা করে গড়ে তুলতে খরচ করতে হয়।

২. **ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ :** ভূমির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে এর যোগান সীমাবদ্ধ। পৃথিবীতে ভূমিসহ প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। মানুষের চেষ্টায় এর হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব নয়। তবে ব্যবহারযোগ্য ভূমির পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটতে পারে। মানুষের অবহেলা, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ যেমন হ্রাস পেতে পারে, তেমনি মানুষের প্রচেষ্টায় পতিত জমি পুনরুদ্ধার করে পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে।

৩. **উর্বরাশক্তির তারতম্য :** ভূমির অপর বৈশিষ্ট এই যে, সকল ভূমি সমজাতীয় বা একই গুণ সম্পন্ন নয়। অর্থাৎ সকল ভূমির উর্বরতা শক্তি একরূপ নয়। তেমনি সকল কয়লাখনিতে বা তেলকূপে একই জাতীয় কয়লা বা তেল পাওয়া যায় না। তাছাড়া অবস্থানের দিক থেকেও তারতম্য রয়ে গেছে। কোন জমি অবস্থানের দিক অন্যটির চেয়ে উন্নত থাকে।

৪. **ভূমি স্থানান্তরযোগ্য নয় :** ভূমি স্থানান্তর করা যায় না অর্থাৎ এক যায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু অন্যান্য উপাদান যেমন শ্রম ও মূলধন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা যায়। ভূমির ক্ষেত্রে ভৌগোলিক গতিশীলতা নেই।

৫. **ভূমি স্থায়ী উপাদান :** ভূমি অবিনশ্বর, এর কোন ক্ষয় নেই। তাই এটি একটি স্থায়ী উপাদান। কিন্তু অন্যান্য উপাদান যেমন, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি অস্থায়ী।

৬. **ভূমিতে হ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর :** কোন এক খন্ড জমিতে বেশি উৎপাদনের লক্ষ্যে অধিক পরিমাণ শ্রমিক ও মূলধন নিয়োগ করলেও উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পায়। এটাই হল ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি। অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রে এমনটি প্রযোজ্য হলেও ভূমির ক্ষেত্রেই এই বিধি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

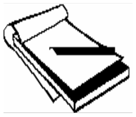

অনুশীলনী ৮.২

১. ভূমি কি? ভূমির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করুন।

পাঠ ৩ : শ্রম : শ্রমের দক্ষতা ও গতিশীলতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- শ্রমের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- শ্রমের যোগান কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা বলতে পারবেন।
- শ্রমের দক্ষতা কি এবং কিসের উপর নির্ভর করে তা বলতে পারবেন।

শ্রমের সংজ্ঞা

সাধারণ অর্থে শ্রম বলতে মানুষের কায়িক পারিশ্রমকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে শ্রম শব্দটি বিশেষ ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন কাজে নিয়োজিত সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক কাজ ও সেবাকর্ম এবং যার বিনিময়ে পরিশ্রমিক পাওয়া যায় তাকেই শ্রম বলা হয়। একজন কৃষক, শিল্প শ্রমিক, বা রিকসা চালকের শারীরিক পরিশ্রম যেমন শ্রম, তেমনি একজন শিক্ষকের শিক্ষাদান বা ডাক্তারের পরামর্শ তেমনি তার বুদ্ধিজাত শ্রম। বস্তুত : মানুষ পরিশ্রমের বিনিময়ে যা কিছু অর্জন করে তাকেই শ্রম বলে। অবশ্য মানুষের সব কাজই শ্রম রূপে গণ্য নয়। কোনরূপ অর্থ উপার্জন ছাড়া কেবল স্নেহের জন্য বা আনন্দ লাভের জন্য যে পরিশ্রম করা হয় তা শ্রম নয়। তাই সন্তান প্রতিপালনের জন্য মাতা-পিতার পরিশ্রম বা কষ্টকে শ্রম বলা হয় না।

শ্রমের বৈশিষ্ট্য

শ্রম উৎপাদনের একটি আদি ও মৌলিক উপাদান। উৎপাদনের উপাদান হিসেবে শ্রমের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে।

নিচে এগুলো আলোচনা করা হল :

১. **শ্রম একটি জীবন্ত উপাদান :** শ্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি ভূমি ও মূলধনের মতো প্রাণহীন একটি জড় পদার্থ নয়। শ্রম শ্রমিকের দৈহিক ও মানসিক শক্তি একটি জীবন্ত উপাদান। পারিশ্রমিকের জন্য শ্রমিক পরিশ্রম দিলেও তার অনুভূতি সত্ত্বা থাকে। শ্রমিকের জীবদ্দশায় তার শ্রম জীবন্ত ও কর্মক্ষম থাকে।

২. **শ্রম ও শ্রমিক অবিচ্ছেদ্য :** শ্রমের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হল যে শ্রমিক ও শ্রম অবিচ্ছেদ্য। ভূমি ও ভূমির মালিক, মূলধন ও মূলধনের মালিক এক নয়, এরা স্বতন্ত্র। কিন্তু শ্রমিক থেকে শ্রমকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

৩. **শ্রম গতিশীল :** শ্রমের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এটি অন্যান্য উৎপাদনের তুলনায় গতিশীল। ভূমির কোন ভৌগোলিক গতিশীলতা নেই, মূলধনের গতিশীলতাও কম। কিন্তু শ্রম অত্যন্ত গতিশীল। কারণ, বিশেষ করে বর্তমানকালে শ্রমিক একস্থান থেকে অন্যস্থানে, এক পেশা থেকে অন্য পেশায় চলে যেতে পারে।

৪. **শ্রম ক্ষণস্থায়ী :** শ্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে, এটি ক্ষণস্থায়ী এবং এর সঞ্চয় সম্ভব নয়। অন্যান্য উপাদান যেমন, ভূমি ও মূলধন কিছুকাল ব্যবহার না করলেও তা ধ্বংস হয়ে যায় না; কিন্তু শ্রম উৎপাদন কাজে ব্যবহার না করলে নষ্ট হয়ে যায়। কোন শ্রমিক একদিন বা এক ঘন্টা কাজ না করলে ঐ সময় নষ্ট হয়ে যায়, যা কোনদিন ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়।

৫. **শ্রমিকের দর কষাকষির ক্ষমতা কম :** উদ্বৃত্ত শ্রমিকের দেশে বিশেষ করে শ্রমের ক্ষণস্থায়ী চরিত্রের কারণে দর কষাকষিতে শ্রমিকদের অবস্থান সুবধিাজনক হয় না। বেশি দিন বেকার থাকার ঝুঁকি অনেকে নিতে চান না। এজন্য স্বল্প মজুরীতে অনেক শ্রমিক কাজ করেন। অবশ্য শ্রমিকগণ ট্রেড-ইউনিয়নের মাধ্যমে মালিক পক্ষের সাথে দর কষাকষি করতে পারে।

৬. **উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমিকের উপস্থিতি অপরিহার্য :** জমিতে ফসল ফলাতে জমির মালিকের উপস্থিতি অপরিহার্য নয়। কিন্তু উৎপাদনের সময় শ্রমিকের উপস্থিতি অপরিহার্য। স্বশরীরে উপস্থিত থেকেই তাকে শ্রমের যোগান দিতে হয়।

৭. **শ্রমের যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি সময় সাপেক্ষ :** শ্রমের যোগান ভূমির মতো একেবারে নির্দিষ্ট না হলেও এর হ্রাস বৃদ্ধি সময় সাপেক্ষ। তাই শ্রমের চাহিদা পরিবর্তনের সাথে সাথে এর যোগানের পরিবর্তন সম্ভব নয়। কারণ, শ্রমের যোগান একটি দেশের জন্মহার, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। তাই মজুরী বাড়লেও শ্রমের যোগান দ্রুত বাড়ে না, আবার মজুরী কমলেও যোগান দ্রুত কমেনা। তাই স্বল্পকালে শ্রমিকের যোগান সীমাবদ্ধ থাকে।

উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল শ্রম

শ্রমকে উৎপাদনশীল এবং অনুৎপাদনশীল এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তবে উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝায় এ নিয়ে অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে মতভেদ আছে। নিচে বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

ফিজিওক্র্যাটদের ধারণা : অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে ফিজিওক্র্যাট নামে পরিচিত এক শ্রেণীর লেখকদের আর্বিভাব ঘটে।তাঁদের মতে, যে শ্রম অতিরিক্ত কিছু উৎপাদন করে তাকে উৎপাদনশীল শ্রম বলা হয়। অপরপক্ষে যে শ্রম অতিরিক্ত কোন কিছু উৎপাদন করে না তাকে অনুৎপাদনশীল শ্রম বলা হয়। এ ধারণা অনুযায়ী কেবল যে সমস্ত শ্রমিক কৃষি ক্ষেত্রে ও শিল্প কারখানায় নিয়োজিত আছে তাদের শ্রমকে উৎপাদনশীল বলা হয়। পক্ষান্তরে ব্যবসায় বা অন্যান্য কাজে নিয়োজিত শ্রমিক যারা নতুন কিছু উৎপাদন করে না সেগুলি অনুৎপাদনশীল শ্রম।

ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদ : এ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো, জে,এস,মিল প্রমুখ ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণের মতে, যে শ্রমের দ্বারা বস্তুজাত কোন দ্রব্য উৎপাদন করা হয় তাকে উৎপাদনশীল শ্রম বলা হয়। অর্থাৎ কৃষক, তাঁতী, শ্রমিক বস্তুগত দ্রব্য উৎপাদন করে বলে তাদের শ্রমকেই উৎপাদনশীল শ্রম বলে। পক্ষান্তরে, যে শ্রমের সাহায্যে দৃশ্যমান বা বস্তুজাত কোন দ্রব্য উৎপাদিত হয় না সেই শ্রমকে অনুৎপাদনশীল শ্রম বলে গণ্য করা হয়। এই সংজ্ঞানুযায়ী, শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবী, গায়ক প্রভৃতির কাজকে অনুৎপাদনশীল শ্রম বলা হয়।

আধুনিক মতবাদ : আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ ফিজিওক্র্যাট বা ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণের মতবাদ সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে, যে শ্রম কোন উপযোগ সৃষ্টি করে তাকেই উৎপাদনশীল শ্রম বলা হয়। এ ধারণা অনুযায়ী, শ্রম বস্তুজাত ও অবস্তুজাত যাই উৎপন্ন করুক না কেন, যদি তা মানুষের অভাব পূরণ করতে পারে তা হলে সেটা উৎপাদনশীল শ্রম। উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টি বুঝায়। সুতরাং ডাক্তার, শিক্ষক, উকিল, গায়ক, কবি প্রভৃতি সকলের শ্রমই উৎপাদনশীল। কারণ, সমাজে তাদের সেবার চাহিদা অছে। অপরপক্ষে যে শ্রম, কোন উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে না, যার কোন বিনিময় মূল্য নেই, তাকে অনুৎপাদনশীল শ্রম বলা হয়।

শ্রমের যোগান ও দক্ষতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?

শ্রমের যোগান বলতে একটি দেশের অভ্যন্তরে কাজ করতে সক্ষম ও ইচ্ছুক ব্যক্তিদেরকে বুঝায়। অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যার সেই অংশকে বুঝায় যারা উৎপাদনে শ্রম দানে সক্ষম। শ্রমের যোগান দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা : (১) জনসংখ্যা ও (২) শ্রমের দক্ষতা

১. **জনসংখ্যা :** জনসংখ্যাই সকল শ্রমের উৎস। কোন দেশের শ্রমের যোগান সেই দেশের মোট জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। যে দেশে যত বেশি লোক বাস করে সে দেশে শ্রমের যোগান তত অধিক। পক্ষান্তরে, যে দেশে লোকসংখ্যা কম সেখানকার শ্রমের যোগান তুলনামূলকভাবে তত কম। তবে শ্রমের যোগান হিসেব করতে জনসমষ্টির যে অংশ কর্মক্ষম তাদেরকেই ধরতে হবে। অতি বৃদ্ধ, শিশু, উন্মাদ ইত্যাদি শ্রম হিসেবের সময় বিবেচনায় আসে না।

২. **শ্রমের দক্ষতা :** শ্রমের দক্ষতা ও নিপুণতা শ্রমের যোগান বাড়ায়। একই পরিমাণ শ্রম সম্পন্ন দুটি দেশের যে দেশের শ্রমের দক্ষতা বেশি সেই দেশের শ্রমের যোগান বেশি বিবেচিত হবে। শ্রমের দক্ষতা না বাড়ায়ে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ালেই যে শ্রমের যোগান বাড়বে এমন নয়। শ্রমের সংখ্যা কম থাকলেও তারা যদি দক্ষ হয় তবে শ্রমের যোগান বাড়বে। আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতিতে শ্রমিকের দক্ষতার গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই শ্রমিকের দক্ষতার উপর শ্রমের যোগান বহুলাংশে নির্ভরশীল।

শ্রমের যোগান কাজের সময়ের উপরও নির্ভর করে। দুটি দেশে যদি শ্রমিকের সংখ্যা একই হয় কিন্তু একটি দেশের শ্রমিক সপ্তাহে ৪০ ঘন্টা এবং অপর দেশে সপ্তাহে ৪৪ ঘন্টা কাজ করে তবে শেষোক্ত শ্রমিকের যোগান বেশি হবে।

শ্রমের দক্ষতা

শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতাকে শ্রমের দক্ষতা বলা হয়। বস্তুত: দক্ষ শ্রম শক্তি যে কোন দেশের একটি মূল্যবান সম্পদ। শ্রমিকের যোগান কেবল জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে না, বরং শ্রমিকের কর্মদক্ষতার উপরও নির্ভর করে। সুতরাং শ্রমিকের সংখ্যা না বাড়িয়ে কেবল তাদের দক্ষতা বাড়িয়ে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়। এভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে সমস্যা সৃষ্টি না করে শ্রমের দক্ষতা বাড়িয়ে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যায়।

শ্রমের দক্ষতা অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এগুলি হল :

১। কাজ করার যোগ্যতা
২। কাজ করার ইচ্ছা
৩। সংগঠনের দক্ষতা
৪। কারখানার পরিবেশ

নিম্নে বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো-

১. কাজ করার ক্ষমতা

শ্রমিকের কাজ করার ইচ্ছা আবার কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথা : (ক) দৈহিক যোগ্যতা, (২) কারিগরি যোগ্যতা, (গ) বুদ্ধিগত যোগ্যতা এবং (ঘ) নৈতিক যোগ্যতা।

ক. **দৈহিক যোগ্যতা :** শ্রমিকের দক্ষতা বহুলাংশে তার দৈহিক যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। একজন সুস্থ ও সবল শ্রমিক একজন অসুস্থ ও দুর্বল শ্রমিক অপেক্ষা অধিক কাজ করতে সক্ষম। দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু, উন্নত খাদ্য, ভাল পোষাক পরিচ্ছদ, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান প্রভৃতি শ্রমিকদের কর্মনৈপুণ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, শীত প্রধান দেশে শ্রমিকগণ অধিক কাজ করতে পারে। তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ে না। অন্যদিকে,

গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শ্রমিকগণ অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দীর্ঘসময় ধরে কাজ করতে সক্ষম হন না। তাছাড়া জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণেও শ্রমিকদের দৈহিক যোগ্যতা অধিক হয়। যেমন, ইংরেজরা বংশগত কারণে বাংলাদেশীদের তুলনায় দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী।

খ. কারিগরি যোগ্যতা : কারিগরি যোগ্যতা বলতে বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ কর্মদক্ষতাকে বুঝায়। কারিগরি যোগ্যতা গড়ে তুলতে কারিগরি জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এই কারিগরি যোগ্যতা শ্রমিকদের দক্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করতে পারে। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকদের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদানের বিষয়টির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ. বুদ্ধিগত যোগ্যতা : বুদ্ধিগত যোগ্যতা শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। এই বুদ্ধিগত যোগ্যতা প্রধানতঃ শিক্ষার উপর নির্ভর করে। উপযুক্ত শিক্ষা দিক্ষার সুযোগপ্রাপ্ত শ্রমিকগণ কর্মে উৎসাহী ও উদ্যোগী হয়। এতে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। এজন্যই নিঃসন্দেহে শিক্ষিত শ্রমিক অশিক্ষিত শ্রমিকের চেয়ে অধিক কর্মদক্ষ।

ঘ. নৈতিক যোগ্যতা : শ্রমিকের নৈতিক চরিত্রের উপর তার কর্মদক্ষতা নির্ভর করে। যে শ্রমিক সৎ ও বিশ্বাসী তার কর্মদক্ষতা বেশি। কর্তব্যনিষ্ঠ, দায়িত্ব সম্পন্ন ইত্যাদি গুণের অধিকারী শ্রমিক স্বাভাবিকভাবেই অধিক কর্মদক্ষতার অধিকারী হবে। অপরপক্ষে, নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটলে শ্রমিকগণ ফাঁকিবাজ ও কাজে অমনোযোগী হয়ে পড়ে এবং তাদের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

২. কাজ করার ইচ্ছা

শ্রমিকদের দক্ষতা তাদের কাজ করার ইচ্ছার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। শ্রমিকদের কাজের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত টান ও উৎসাহ না থাকলে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে না। এই ইচ্ছা আবার নির্ভর করে কাজের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা, ভবিষ্যত সফলতা ও উন্নতির সম্ভাবনা এবং ঐ কাজে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা, বৈচিত্র ও প্রকৃতির উপর। যে সব কাজে ক্রমাগত বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির সুবিধা আছে শ্রমিকগণ সে সব কাজে নিয়োজিত থাকতে উৎসাহ পায়। চাকুরীর স্থায়িত্ব, পুরস্কারের ব্যবস্থা, অবসর ভাতা, নিয়মিত মজুরী, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ প্রভৃতি শ্রমিকগণের কাজ করার ইচ্ছা বৃদ্ধি করে।

৩. সংগঠনের দক্ষতা

সংগঠনের দক্ষতার উপরও শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে। সংগঠক (বা মালিক) উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে। মালিকের সংগঠন ক্ষমতা উচ্চমানের হলে বা উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হলে তার অধীনে শ্রমিকগণ সহজেই দক্ষ হয়ে উঠে।

৪. কারখানার পরিবেশ

কারখানার পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পরিচ্ছন্নতা, প্রচুর আলো বাতাস, ব্যক্তি স্বাধীনতা, অংশীদারিত্বে ব্যবস্থাপনা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি বিষয়ও শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। তাছাড়া, উন্নতমানের আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তিগত উত্তরণ শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দেয়।

৫. সামাজিক নিরাপত্তা

সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দেয়। অসুস্থতা, বেকারত্ব, দুর্ঘটনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের সুবিধা থাকলে শ্রমিকগণ কাজে উৎসাহ পায় এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে। ফলে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

শ্রমের গতিশীলতা

শ্রমের গতিশীলতা বলতে শ্রমিকদের একস্থান থেকে অন্য স্থানে গমন, এক পেশা ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ, এক প্রতিষ্ঠান ছেড়ে অন্য প্রতিষ্ঠানে যোগদান, এমন কি একই প্রতিষ্ঠানের একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে নিয়োগপ্রাপ্তি ইত্যাদিকে বুঝায়। অর্থাৎ শ্রমিকগণের নিজেদের সুবিধামত প্রতিষ্ঠান, পেশা, কর্মস্থান পরিবর্তনের সুবিধা থাকা। শ্রমিকদের এই স্থানান্তরকে শ্রমের গতিশীলতা বলে। যেমন একজন যশোরের গ্রামাঞ্চল থেকে ঢাকায় চাকুরী গ্রহণ, আইন ব্যবসা ত্যাগ করে সহকারী জজের চাকুরী গ্রহণ, ব্যাংকের অফিস সহকারী থেকে অফিসার পদে উন্নীত হওয়া, সাটলিপিকার থেকে কম্পিউটার অপারেটর হওয়া এভাবে স্থান, প্রতিষ্ঠান, অবস্থান পরিবর্তন করাই শ্রমের গতিশীলতা নামে পরিচিত।

শ্রমের গতিশীলতা চার প্রকারের হতে পারে যথা- (১) ভৌগোলিক গতিশীলতা, (২) শিল্পগত গতিশীলতা (৩) পেশাগত গতিশীলতা এবং (৪) স্তরগত গতিশীলতা।

১. **ভৌগোলিক গতিশীলতা :** কোন শ্রমিক চাকুরীর জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচলকে ভৌগোলিক গতিশীলতা বলে। যেমন, মাগুরা বস্ত্রকলের একজন শ্রমিক নারায়ণগঞ্জের একটি বস্ত্রকলে চাকুরী গ্রহণ করতে পারে। শ্রমিকের এরূপ স্থান পরিবর্তনকে ভৌগোলিক বা স্থানগত গতিশীলতা বলা হয়।
২. **শিল্পগত গতিশীলতা :** কোন শ্রমিক যখন এক শিল্প ত্যাগ করে অন্য একটি শিল্পে যোগদান করে তখন তাকে শিল্পগত গতিশীলতা বলে। যেমন, একজন পাটকল শ্রমিক বস্ত্রকলে কাজে যোগদান করে এরূপ এক শিল্প ত্যাগ করে অন্য শিল্পে যোগদান করাকে শিল্পগত গতিশীলতা বলে।
৩. **পেশাগত গতিশীলতা :** যখন কোন শ্রমিক একটি পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশা গ্রহণ করে তখন তাকে পেশাগত গতিশীলতা বলে। যেমন, একজন অধ্যাপক তাঁর অধ্যাপনা ছেড়ে একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক অফিসারের দায়িত্ব গ্রহণ করে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে, তখন এরূপ পরিবর্তনকে পেশাগত গতিশীলতা বলে। অথবা একজন রিকশা চালক নিজ পেশা ছেড়ে যদি বস্ত্র কলের শ্রমিকের পেশা গ্রহণ করে তবে শ্রমিকের এই পেশা পরিবর্তনকে পেশাগত গতিশীলতা বলে। এরূপ পরিবর্তন আবার দু'ধরনের হতে পারে। যদি একজন কম্পিউটার অপারেটর সরকারী অফিস ছেড়ে বেসরকারী অফিসে ঐ একই কাজ গ্রহণ করে এরূপ পরিবর্তনকে অনুভূমিক গতিশীলতা বা সমান্তরাল গতিশীলতা বলে। এখানে কাজের ধরনে তেমন পরিবর্তন আসে না। অপরপক্ষে, যদি শ্রমিক কোন প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার অপারেটর পদ থেকে নতুন প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার প্রোগ্রামারের পদে আসীন হয় তবে এরূপ পরিবর্তনকে উল্লম্ব গতিশীলতা বলা হয়।
৪. **স্তরগত গতিশীলতা :** কোন শ্রমিক যখন একই উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে গমন করে তখন এরূপ পরিবর্তনকে স্তরগত গতিশীলতা বলে। যেমন, গার্মেন্টস কারখানার একজন শ্রমিক সেলাই কাজে দক্ষতা প্রদর্শন করে সুপারভাইজারের কাজে নিয়োজিত হতে পারে যাকে স্তরগত গতিশীলতা বলা হয়।

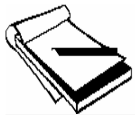

অনুশীলনী ৮.৩

১. শ্রম কি? শ্রমের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।
২. উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল শ্রমের মধ্যে তফাৎ বর্ণনা করুন।
৩. শ্রমের দক্ষতা বলতে কি বুঝায়? শ্রমের দক্ষতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে? বর্ণনা করুন।
৪. শ্রমের গতিশীলতা কি? শ্রমের গতিশীলতা কি কি রকমের হতে পারে? বর্ণনা করুন।

পাঠ ৪ঃ পুঁজি বা মূলধনঃ সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- পুঁজির বা মূলধনের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পুঁজির বৈশিষ্ট্য কি কি তা বলতে পারবেন।
- পুঁজিগঠন কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মূলধনের দক্ষতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা বলতে পারবেন।

পুঁজি বা মূলধন কি?

সাধারণ অর্থে, পুঁজি বা মূলধন বলতে ব্যবসায়ে নিয়োজিত টাকা পয়সাকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে মূলধন শব্দটি বিশেষ অর্থ জ্ঞাপন করে। মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যয়িত না হয়ে পুনরায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় এবং নতুন আয় প্রবাহ সৃষ্টি করে তাকে মূলধন বলে। মূলধন মানব সৃষ্ট, প্রকৃতি প্রদত্ত নয়। যেমন, বঙ্গবন্ধু বহুমুখী যমুনা সেতু, রেল লাইন, কারখানা, কাঁচামাল, কৃষকের লাঙ্গল, অফিস, গুদাম, ওয়ারলেস সেট ইত্যাদি মূলধন। অর্থনীতিবিদ বম ওয়ার্কের ভাষায়, মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান। (Capital is the produced means of production)। অর্থনীতিবিদ চ্যাপম্যান বলেন, "যে সম্পদ কোন আয় সৃষ্টি করে অথবা উপার্জনে সহায়তা করে তা-ই হল মূলধন। (Capital is wealth which yields an income or aids in the production of an income)। কোন দ্রব্য মূলধন হিসেবে গণ্য হবে কিনা তা ঐ দ্রব্যের ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। বাড়ী-ঘর যখন বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন এটা মূলধন নয়। কিন্তু ঐ বাড়ী-ঘর যদি অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন এটা মূলধন। সুতরাং যে সব দ্রব্য সামগ্রী মানুষের শ্রম দ্বারা উৎপাদিত এবং যা বর্তমান ভোগের জন্য ব্যবহৃত না হয়ে অধিক উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকেই অর্থনীতিতে পুঁজি বা মূলধন বলা হয়।

মূলধনের বৈশিষ্ট্য

মূলধন হল উৎপাদনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নিম্নে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহের জন্য মূলধনকে অন্যান্য উপাদান থেকে পৃথক বলে গণ্য করা হয়। যথা :

১. **মূলধন উৎপাদনশীল :** আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা মূলধনের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। পুঁজি উৎপাদন ক্ষেত্রে মূলধনের গুরুত্ব আরো অধিক। যেমন, খালি হাতের চেয়ে জাল দিয়ে অধিক পরিমাণ মাছ ধরা যায়। অত্যাধুনিক জালের সাহায্যে আরো অধিক পরিমাণ মাছ ধরা হয়। সুতরাং পুঁজি নতুন পণ্য ও সেবা উৎপাদন করতে সাহায্য করে।

২. **মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান :** মূলধনের অপর বৈশিষ্ট্য হল যে, এটি উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান। ভূমি বা শ্রমের ন্যায় মূলধন কোন মৌলিক উৎপাদন নয়। মানুষের শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদের যৌথ প্রচেষ্টায় মূলধন সৃষ্টি হয় যা মানুষ সরাসরি ভোগ না করে ভবিষ্যৎ উৎপাদন কার্যে ব্যবহার করে।

৩. **মূলধন অতীত শ্রমের ফল :** মূলধন মানুষের অতীত শ্রমের পুঞ্জিভুত ফল। যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, কাঁচামাল প্রভৃতি দ্রব্যাদি যা মূলধন হিসেবে গণ্য হয় তা মানুষের পরিশ্রমের দ্বারা সৃষ্টি। জমির মতো এটি প্রাকৃতিক উপাদান নয়।

৪. **মূলধন সঞ্চয়ের ফল :** মূলধন হল সঞ্চয়ের ফল। মূলধন বৃদ্ধির জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়। মূলধন গঠন করতে হলে বর্তমান আয় বা উৎপাদনের একটি অংশ ভোগে না লাগিয়ে উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয়। তাই মূলধন সৃষ্টি করতে মানুষকে তার আয়ের একাংশ বর্তমান ভোগে ব্যবহার না করে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে হবে।

৫. **মূলধন অস্থায়ী :** মূলধন স্থায়ী সম্পদ নয়-এর ক্ষয়ক্ষতি আছে। যন্ত্রপাতি বা ঘরবাড়ীর আয়ুষ্কাল নির্দিষ্ট। দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে মূলধন দ্রব্যসামগ্রী ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং অকেজো হয়ে পড়ে। ফলে এর পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়।

৬. **মূলধনের উৎপাদন খরচ আছে :** মূলধন মানুষ দ্বারা উৎপাদিত। মূলধন প্রাকৃতিক সম্পদ নয়। তাই মূলধনের উৎপাদন খরচ আছে।

৭. **মূলধন সমজাতীয় নয় :** সকল মূলধন একই গুণসম্পন্ন নয়। বিভিন্ন মূলধনের গুণগত পার্থক্য আছে এটি স্বতন্ত্র ক্রিয়াসম্পন্ন বিবিধ বস্তুর একটি জটিল সমষ্টি।

৮. **মূলধন আয়ের উৎস :** মূলধন ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য হল ভবিষ্যৎ আয়ের পথ সৃষ্টি করা। মূলধন ব্যবহার করলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হয়। এজন্য অধ্যাপক মার্শাল মূলধনকে আয়ের উৎস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূলধনকে নানাভাবে ভাগ করা যায়। নিম্নে এসব শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করা হল :

১. **ব্যক্তিগত মূলধন ও জাতীয় মূলধন :** মালিকানার ভিত্তিতে মূলধনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়ঃ যথা - (ক) জাতীয় মূলধন এবং (খ) ব্যক্তিগত মূলধন। যে সকল মূলধন কোন ব্যক্তি বিশেষের মালিকানায় থাকে তাকে ব্যক্তিগত মূলধন বলা হয়। যেমন – ব্যক্তির মালিকানাধীন কল-কারখানা, ঘর-বাড়ী, শেয়ার ইত্যাদি। যে মূলধনে সমষ্টিগত মালিকানা থাকে অর্থাৎ রাষ্ট্রের অধীনে যে সকল মূলধন থাকে তাকে জাতীয় মূলধন বলা হয়। জাতীয় মূলধন সরকারী মূলধন ও ব্যক্তিগত মূলধন উভয়কে নিয়েই গঠিত হয়।

   অর্থাৎ একটি দেশের সরকারী ও বেসরকারী মূলধন মিলিয়েই জাতীয় মূলধন গড়ে উঠে। যেমন, রাষ্ট্রায়ত্ত বা রাষ্ট্র মালিকানাধীন কলকারখানা, ব্যাংক, রেলওয়ে, বিমান এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সকল প্রকার কলকারখানা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সব কিছুই জাতীয় মূলধনের অন্তর্গত।

২. **ভোগ্য মূলধন ও উৎপাদক মূলধন :** ব্যবহারের ভিত্তিতে মূলধনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা (ক) ভোগ্য মূলধন এবং (খ) উৎপাদন মূলধন। উৎপাদন চলাকালে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের ভরণ পোষণ ও জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য যে মূলধন ব্যবহৃত হয় তাকে ভোগ্য মূলধন বলে। যেমন – শ্রমিকদের খাদ্য, বাসস্থান, বস্ত্র ইত্যাদি। অপরপক্ষে, যে সকল মূলধন উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে তাকে উৎপাদক মূলধন বলে। যেমন, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি।

৩. **স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধন :** স্থায়িত্বের ভিত্তিতে মূলধনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় – যথা (ক) স্থায়ী মূলধন ও (খ) চলতি মূলধন। যে মূলধন উৎপাদন কাজে একবার ব্যবহারেই শেষ হয়ে যায় না; বরং তা বহুদিন ধরে বারবার ব্যবহৃত হয় তাকে স্থায়ী মূলধন বলে। যেমন – কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, বাড়ীঘর, গুদাম প্রভৃতি স্থায়ী মূলধনের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে, যে মূলধন মাত্র একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হয়ে যায় তাকে চলতি

মূলধন বলে। যেমন, তুলা, পাট, কাঠ, কয়লা প্রভৃতি। এ সকল দ্রব্য একবার ব্যবহারের ফলেই এদের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কয়লা একবার পুড়ালে ছাই হয়ে যায় – এর অস্তিত্ব থাকে না। তুলা থেকে সুতা প্রস্তুত করলে তুলার আকৃতিতে পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং যে সকল মূলধন মাত্র একবার ব্যবহারের ফলেই শেষ হয়ে যায় তাকে চলতি মূলধন বলে।

৪. **নিমজ্জমান মূলধন ও ভাসমান মূলধন :** ব্যবহরের ভিত্তিতে মূলধনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যথা – (ক) নিমজ্জমান মূলধন ও (খ) ভাসমান মূলধন। যে সব মূলধন মাত্র একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় এবং যা অন্য কাজে ব্যবহার করা যায় না তাকে নিমজ্জমান বা আবদ্ধ মূলধন বলে। যেমন- রেল ইঞ্জিন, লোহা গলাবার চুল্লী ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, যে সব মূলধন বিভিন্ন উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয় বা এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পে স্থানান্তর করা যায় তাকে ভাসমান মূলধন বলে। যেমন – কয়লা, বিদ্যুৎ, কাঁচামাল, ইঞ্জিন ইত্যাদি।

মূলধনের গুরুত্ব ও কার্যাবলী

আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধন হ'ল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মূলধন ছাড়া কোন কিছু উৎপাদন করা সম্ভব নয়। শিল্প বিপ্লবের আগে মূলধনের গুরুত্ব এতটা ছিল না। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পর হতেই উৎপাদন ক্ষেত্রে মূলধনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সব উপাদান উৎপাদনশীল হলেও মূলধনের উৎপাদনশীলতা সর্বাধিক। বস্তুতঃ আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে মূলধন নির্ভর। মূলধনের প্রাচুর্যই পশ্চিমের দেশসমূহের উন্নত দেশরূপে গণ্য হবার কারণ। তাই মূলধনের প্রাচুর্য উন্নয়নের চাবিকাঠি। আমেরিকা, বৃটেন, জাপান, জার্মান, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের উন্নয়নের পশ্চাতে প্রধান অবদান রয়েছে মূলধনের প্রাচুর্য।

নিম্নে মূলধনের কার্যাবলী আলোচনা করা হল :

১. **মূলধন উৎপাদন বৃদ্ধি করে :** মূলধন উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান সহায়ক। মূলধন ব্যবহারের ফলে প্রত্যেকটি উৎপাদনের উপাদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক যখন আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তখন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি ও উন্নতমানের দ্রব্যাদি উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। তাই মূলধন ব্যবহারের ফলে দ্রব্যের পরিমাণ শুধু বৃদ্ধি পায় না, সেই সঙ্গে উৎকৃষ্টমানের দ্রব্যও উৎপাদিত হয়। ফলে সার্বিকভাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

২. **শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে :** মূলধন শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রমিকদের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে। মূলধন শ্রমিকদের দৈহিক শ্রম লাঘব করে। ভারী ও কঠিন কাজ যা শ্রমিকদের দৈহিক শক্তির উপর চাপ প্রদান করতো তা এখন যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে সম্পন্ন করা যায়।

৩. **মূলধন যন্ত্রপাতি যোগান দেয় :** মূলধন বৃদ্ধির মাধ্যমে কারখানায় উন্নতমানের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে সাহায্য করে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য মোটা অংকের অর্থের প্রয়োজন হয়। মূলধন এই অর্থ যোগান দিয়ে তা সম্ভব করে।

৪. **মূলধন কাঁচামাল যোগান দেয় :** মূলধন শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ করতে সাহায্য করে। কোন শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করতে কাঁচামাল প্রয়োজন। এই কাঁচামাল যোগান দিতে মূলধন অপরিহার্য। অতএব, কাঁচামাল সরবরাহ করা মূলধনের অন্যতম কাজ।

৫. **মূলধন বৃহদায়তন উৎপাদনে সহায়তা দেয় :** মূলধন ব্যবহারের ফলেই বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। মূলধন ব্যতীত বৃহদায়তন শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করা

অসম্ভব। মূলধনের সাহায্যেই উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং শ্রম বিভাগের সুবিধা লাভ সম্ভবপর হয়েছে। এর ফলে স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

৬. **মূলধন উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সমন্বয় ঘটায় :** মূলধন ব্যবহারের দ্বারা উৎপাদন ও শ্রমের মধ্যে সমন্বয় ঘটে। পূর্বে শ্রমিক কোন দ্রব্য উৎপাদন করে বিক্রয় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। কিন্তু শ্রম বিভাগ প্রবর্তনের পর কোন শ্রমিকের কাজ শেষ হবার পরপরই তার দৈনন্দিন ভরণ পোষণের জন্য পারিশ্রমিক পরিশোধ করা হয় এবং আর্থিক মূলধন থেকেই তা সম্ভব হয়। তাছাড়া মূলধন একটি দ্রব্য উৎপাদনের কাজ আরম্ভ এবং তা সম্পন্নের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে-ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

৭. **মূলধন সময় সংক্ষেপ করে :** মূলধন ব্যবহারের ফলে সময় সংক্ষেপ করা সম্ভবপর হয়েছে। শ্রম বিভাগের ফলে প্রত্যেকটি শ্রমিককে যেহেতু একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে হয় তাই প্রত্যেকটি স্তরের কাজ স্বল্প সময়েই সম্পন্ন করা সম্ভব হয় এবং সময়ের অপচয় রোধ করা যায়।

৮. **মূলধন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে :** মূলধনের সাহায্যে দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব হয়েছে। মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়ে যায়। এর ফলে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। বিকাশমান দেশগুলোতে বেকার সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ মূলধনের অভাব। মূলধনের যোগান বৃদ্ধি করতে পারলে এসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা যাবে।

মূলধন গঠন কাকে বলে ?

অর্থনীতিতে মূলধন গঠন বলতে মূলধন বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে বুঝায়। কোন দেশ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার মূলধন সম্পদ বা পুঁজিদ্রব্যের যে বৃদ্ধি সাধন করে তাকে মূলধন গঠন বলে। অধ্যাপক বেনহাম (Benham) বলেন "The amount which a community adds to its capital during a period is known as capital formation during that period." মানুষ তার আয়ের সবটুকু অংশই ভোগ করে না; সে এর থেকে কিছু অংশ সঞ্চয় করে। এই সঞ্চয় থেকে মূলধন সৃষ্টি হয়। তবে সঞ্চয় মানেই মূলধন নয়। সঞ্চয়ের যে অংশ নতুন শিল্প-কারখানা, যন্ত্রপাতি, রাস্তাঘাট যানবাহন ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করা হয় তাই হল মূলধন গঠন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা কালে কোন দেশ তার বর্তমান পুঁজি যে পরিমাণ বাড়াতে পারে বা সমর্থ হয় সেটাই তার পুঁজিগঠন বা বিনিয়োগের পরিমাণ।

মূলধন গঠন কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে

মূলধন গঠন সঞ্চয়ের উপর নির্ভরশীল। মূলধন গঠন প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে; যথা – (১) সঞ্চয়ের সামর্থ, (২) সঞ্চয়ের ইচ্ছা এবং (৩) বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা।

১. সঞ্চয়ের সামর্থ

মানুষের সঞ্চয়ের সামর্থ তার আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। আয় যত বেশি হবে সঞ্চয়ের সামর্থ তত বেশি হবে। মানুষের আয় থেকে তাঁদের জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের পরও যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে সঞ্চয় সম্ভব হয়। অতিরিক্ত আয় থেকে সঞ্চয় এবং সেই সঞ্চয়ই মূলধন গঠনে সাহায্য করে। সুতরাং সঞ্চয়ের সামর্থের উপরই মূলধনের পরিমাণ নির্ভর করে। বাংলাদেশের মত গরীব দেশের লোকের মাথাপিছু আয় কম, তাই তাদের সঞ্চয়ের সামর্থও কম। যে কোন দেশের আয়ের পরিমাণ, মূল্যস্তর, পরিবারের আয়তন, রুচি, অভ্যাস, কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি সঞ্চয়ের সামর্থ নির্ধারণ করে।

২. সঞ্চয়ের ইচ্ছা

সঞ্চয়ের পরিমাণ শুধুমাত্র সঞ্চয়ের সামর্থের উপর নির্ভর করে না; সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপরও নির্ভর করে। সঞ্চয় করবার ইচ্ছা না থাকলে কখনও সঞ্চয় হতে পারে না। কারণ, বাস্তবে দেখা যায় যে, কোন লোকের আয় অনেক, কিন্তু সে অমিতব্যয়ী, অপরিণামদর্শী। তাই তার কোন সঞ্চয় নেই, সঞ্চয়ের প্রতি কোন গুরুত্ব সে দেয় না। অথচ নিম্ন আয়ের লোক, যেমন গ্রামীন ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত মহিলাদের ইচ্ছা থাকার কারণে এবং বাধ্যবাধকতা থাকায় তারা সঞ্চয় করতে আগ্রহী হন। দূরদৃষ্টি, পারিবারিক স্নেহ মমতা, উচ্চাকাংক্ষা, মর্যাদা লাভের ইচ্ছা, জানমালের নিরাপত্তা, সুদের হার, কর ব্যবস্থা, কৃচ্ছতা অবলম্বন, পরিবেশগত অবস্থা প্রভৃতি বিয়ষগুলি সঞ্চয়ের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে। নিচে এগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

ক) **দূরদৃষ্টি :** মানুষের ভবিষ্যত সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। ভবিষ্যতে সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা, বিবাহ, নিজের অবর্তমানে সংসারের ভরণ-পোষণ ও নিরাপত্তা, ভবিষ্যত বিপদ-আপদে কোন কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লে বা বার্ধক্যের কারণে অক্ষম হয়ে পড়লে – এসব বিপদ মোকাবিলা করতে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লোক সঞ্চয় করে। ফলে তাকে কারো গলগ্রহ হতে হবে না। সুতরাং যারা দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ তারা অধিক সঞ্চয় করে।

খ) **পারিবারিক েহে মমতা :** পারিবারিক স্নেহ মমতা যে সমস্ত লোকের বেশি, তাদের সঞ্চয়ের ইচ্ছা তত প্রবল। এভাবে মাতাপিতা সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতার বসবর্তী হয়ে তাদেরকে সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখতে অধিক পরিমাণে সঞ্চয় করে। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অধিক সহায় সম্পত্তি রেখে যাবার জন্যে লোকে বর্তমানে ত্যাগ স্বীকার করেই সঞ্চয় করে।

গ) **উচ্চাকাংক্ষা ও মর্যাদা লাভের ইচ্ছা :** সমাজে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের আশায় মানুষ সঞ্চয় করে। বিশেষ করে বর্তমান যুগে যার টাকা পয়সা যত বেশি তার সামাজিক পরিচিতি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি তত বেশি। ধনবান লোক সমাজে মর্যাদাবান। অনেকে মনে করেন পৃথিবী টাকার বশ। তাই উচ্চাকাংক্ষা সম্পন্ন ব্যক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে তার ইচ্ছা পূরণ করে।

ঘ) **জানমালের নিরাপত্তা :** জানমালের নিরাপত্তার উপর সঞ্চয় অনেকাংশে নির্ভর করে। অনেক কষ্টে অর্জিত সঞ্চয় যদি সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে নষ্ট হয়, এরূপ সমাজে সঞ্চয় গড়ে উঠা বিঘ্নিত হয়। তাই আইন-শৃংখলা ও জানমালের নিরাপত্তা সঞ্চয় গড়ে তোলার পূর্বশর্ত।

ঙ) **সুদের হার :** সঞ্চয়ের পরিমাণ অনেকটা সুদের হারের উপর নির্ভরশীল। সাধারণত: সুদের হার বেশি হলে সঞ্চয়ের আকাংক্ষা বৃদ্ধি পায়। সুদের হার কমে গেলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা কমে যায়।

চ) **কর ব্যবস্থা ও সরকারী নীতি :** কর ব্যবস্থা ও সরকারী নীতিও সঞ্চয়ের ইচ্ছার উপর প্রভাব বিস্তার করে। কর ব্যবস্থা ও সরকারী নীতি যদি এরূপ হয় যে, সঞ্চিত অর্থের উপর কর দিতে হবে না তাহলে লোকে অধিক সঞ্চয় করতে আগ্রহী হবে। পক্ষান্তরে, সঞ্চয়ের উপর সরকার যদি কর বেশি করে ধার্য করে তবে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি হ্রাস পাবে।

ছ) **শিক্ষা ও সামাজিক রীতি-নীতি :** সঞ্চয়ের পরিমাণ দেশের সামাজিক রীতি-নীতি, শিক্ষা, ধর্ম প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। সাধারণত: শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে লোকে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে। তার ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

জ) **কৃচ্ছতা অবলম্বন :** সামাজিক পরিবেশ, কৃষি ও জীবন যাত্রার ধরন সব মিলিয়ে যদি কোন সমাজ মিতব্যয়ী সমাজ হয়, অর্থাৎ কৃচ্ছতা পালনে আগ্রহী হয় তবে সে সমাজে সঞ্চয়ের পরিমাণ বেশি হবে। যেমন, নেপালের মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের চেয়ে কম অথচ সেখানে সঞ্চয়ের হার বেশি।

৩. বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধা

বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধার উপর সঞ্চয় অনেকখানি নির্ভরশীল। দেশের মূলধনের নিরাপদ ও লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা যত বেশি হবে সঞ্চয়ের পরিমাণ তত বৃদ্ধি পাবে। ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, যৌথ মূলধনী কারবার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ ও লাভজনক বিনিয়োগের সুবিধা যত বাড়বে সঞ্চয়ের প্রতি লোকের আগ্রহ তত বাড়বে। সামগ্রীকভাবে দেশের মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

সুতরাং পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উপরিল্লিখিত কারণসমূহের উপর মূলধন গঠন নির্ভরশীল।

মূলধনের দক্ষতা

মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতাকে মূলধনের দক্ষতা বুঝায়। মূলধন নিয়োগের ফলে দ্রব্যের উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাকে মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতা বলে। উৎপাদনের আয় থেকে অন্যান্য উপাদান ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বাদ দিয়ে মূলধন ব্যবহারের জন্য যে লাভ পাওয়া যায় তা হল মূলধনের উৎপাদনের ক্ষমতা। তবে প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনে প্রত্যেকটি উপাদানের অবদান কতটুকু তা নির্ধারণ শক্ত ব্যাপার। যে মূলধন পণ্যের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা সর্বাধিক, উৎপাদনকারী সেই মূলধন পণ্য ব্যবহারে তত আগ্রহী।

কোন কোন বিষয়ের উপর মূলধনের ক্ষমতা নির্ভর করে।

নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহের উপর মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে

১) **উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা :** উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার উপর মূলধনের দক্ষতা নির্ভর করে। উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে সেখানে উৎপাদনকারী আরো মনোযোগী হয়, বৈচিত্র্যময় দ্রব্য উৎপাদন করে এবং মূলধনের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

২) **উন্নত প্রযুক্তি ও উৎপাদন পদ্ধতি :** উন্নত প্রযুক্তি ও উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগের উপর মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে। পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তে আধুনিক ও নতুন যন্ত্রপাতি অধিকতর উৎপাদনশীল ও দক্ষ।

৩) **শ্রমিকের কর্মদক্ষতা :** শ্রমিকের কর্মদক্ষতার উপর উৎপাদনের দক্ষতা নির্ভর করে। একই যন্ত্রপাতির সাহায্যে দক্ষ শ্রমিক অদক্ষ শ্রমিকের চাইতে অধিক উৎপাদন করে। বস্তুত: দক্ষ শ্রমিক ও আধুনিক যন্ত্রপাতি একত্রে মিলিয়েই এরূপ উৎপাদন সম্ভব হয়।

৪) **মূলধনের পরিমাণ :** উৎপাদন কাজে মূলধনের পরিমাণ পর্যাপ্ত হলে মূলধনের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। মূলধনের পরিমাণ অপর্যাপ্ত হলে উৎপাদিকা শক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার বিঘ্নিত হয়। ফলে উৎপাদন কম হয়। সুতরাং মূলধনের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হলে মূলধনের পরিমাণ যথোপযুক্ত হতে হবে।

৫) **মূলধনের মান :** মূলধনের মান উন্নত হলে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। উন্নত ও নতুন যন্ত্রপাতি পুরাতন যন্ত্রপাতি অপেক্ষা অধিক উৎপাদনশীল।

৬) **মূলধনের উপযুক্ত বিনিয়োগ :** মূলধনের উপযুক্ত বিনিয়োগের দ্বারা এর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। মূলধনের ব্যবহার যথার্থ না হলে তার উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

৭) **উৎপাদনে বৈচিত্র্য প্রবর্তন :** উৎপাদন ক্ষেত্রে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হচ্ছে, বৈচিত্র্যময় উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে এবং মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে উপাদানের নতুন আবিষ্কার, কাঁচামালের নতুন উৎস আবিষ্কার, শিল্প কারখানাকে নতুনভাবে সংগঠিত করা হলে মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৮) **ব্যবসায়ীদের মনোভাব :** মূলধন বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ীগণ আশাবাদী হলে, ঝুঁকি গ্রহণে ইচ্ছুক হলে মূলধনের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, নৈরাশ্য মূলধন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে।

পরিশেষে বলা যায়, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার উপর মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে। ব্যবসা পরিচালনার দক্ষতা মূলধনের যথোপযুক্ত ব্যবহারকে নিশ্চিত করে।

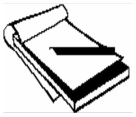

অনুশীলনী ৮.৪

১. পুঁজি কি? পুঁজির বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।
২. মূলধন কত প্রকারের হতে পারে? মূলধনের গুরুত্ব ও কার্যাবলী বর্ণনা করুন।
৩. মূলধন গঠন কাকে বলে? কি কি বিষয়ের উপর মূলধন গঠন নির্ভর করে?
৪. মূলধনের দক্ষতা কি? কি কি বিষয়ের উপর মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে?

পাঠ ৫ : সংগঠন–একক, অংশীদারী ও যৌথমূলধনী মালিকানা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সংগঠন কি তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠকের ভূমিকা কি তা বলতে পারবেন।

উৎপাদনে চতুর্থ ও সর্বশেষ উপাদান হল সংগঠন। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপদানগুলিকে একত্রিত করে তাদেরকে একত্রিত ও সমন্বয় সাধনের কাজ যে করে তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলে। সমন্বয় সাধনের কাজকে সংগঠন বলে এবং এ কাজ যে করে তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলে। শুধুমাত্র ভূমি, শ্রম ও মূলধন কোন কিছু উৎপাদন করতে পারে না। আধুনিককালে উৎপাদন ব্যবস্থা জটিলতর ও ঝুঁকিপূর্ণ আকার ধারণ করছে। একদিকে আধুনিক প্রযুক্তি ও কলকারখানার আবিষ্কার বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার ঘটাচ্ছে, অন্যদিকে শ্রমিকদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, শ্রম বিভাগ সম্প্রসারিত হচ্ছে, শ্রমিক সংগঠন মালিক বা উদ্যোক্তাগণের জন্য জটিলতা সৃষ্টি করছে। এসব মিলিয়ে সংগঠনের দায়িত্ব ও গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্প উৎপাদনে বিনিয়োগ, মূলধন সংগ্রহ, দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ, তত্ত্বাবধান, যন্ত্রপাতি ও জনবল নির্বাচন ও সংগ্রহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। উৎপাদনের সকল উপাদান একত্রিতকরণ, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনে যে ব্যক্তি নিয়োজিত থাকে তাকে সংগঠক বা উদ্যোক্তা এবং যে প্রতিষ্ঠান এসব কাজ করে তাকে সংগঠন বলা হয়। নয়া ক্লাসিকেল অর্থনীতিবিদগণ সংগঠনকে উৎপাদনের একটি আলাদা উপাদান হিসেবে গণ্য করেছেন। তাঁদের মতে সংগঠনের একটি স্বতন্ত্র ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু অনেক অর্থনীতিবিদ সংগঠনকে পৃথক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেন না। তাঁদের মতে সংগঠক ও এক বিশেষ ধরনের শ্রম মাত্র। সংগঠকদের মধ্যে যে বিচক্ষণতা ও কর্মনৈপুণ্যতা বিদ্যমান তা কমবেশি অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে আছে, সুতরাং সংগঠক ও শ্রমিকদের মধ্যে পার্থক্য পরিমাণগত, গুণগত নয়।

সংগঠক বা উদ্যোক্তার গুরুত্ব ও কার্যাবলী

আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায়, সংগঠনের গুরুত্ব ও দায়িত্ব অপরিসীম। উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন প্রকার কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হল:

১) **উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি গ্রহণ :** উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ উদ্যোক্তার অন্যতম প্রধান কাজ। কি ধরনের পণ্য উৎপাদিত হবে, কি পরিমাণে হবে, দ্রব্যের উৎকর্ষ কি মানে হবে, কোথায় কারখানা স্থাপিত হবে, ভূমি ও মূলধন নিয়োগে কি পরিমাণ ব্যয় হবে, যন্ত্রপাতি কেমন হবে, কোন ধরনের শ্রমিক নিয়োগ করা হবে, ব্যবস্থাপনা কেমন হবে ইত্যাদি ব্যবসায়ের নীতি নির্ধারণী বিষয়াদি সংগঠনের

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্যগণ বা উদ্যোক্তা বা ব্যক্তি মালিকানায় মালিককে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। এসব কাজে পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। যদি সংগঠনের কোন নীতি পরিবর্তন করতে হয় সে ব্যাপারেও উদ্যোক্তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

২) **উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানসমূহের সমন্বয় সাধন :** সংগঠক বা উদ্যোক্তাকে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ সংগ্রহ ও সমন্বয় সাধন করতে হয়। উৎপাদনের জন্য জমি সংগ্রহ করা, কারখানার জন্য গৃহ নির্মাণ করা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল সংগ্রহ করা, উৎপাদিত পণ্যের বাজার খুঁজে বের করা, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা উদ্যোক্তাকেই সম্পন্ন করতে হয়। উদ্যোক্তাকে প্রয়োজনানুযায়ী শ্রমিক সংগ্রহ করে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ ভাগ করে দিতে হয় এবং ব্যবস্থাপক নিয়োগ করতে হয়।

৩) **উৎপাদন কাজের তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ :** সংগঠক কেবলমাত্র উৎপাদনের উপাদানগুলি কাজে লাগিয়েই ক্ষান্ত থাকতে পারে না, তাকে উৎপাদন চলাকালে সঠিকভাবে বিভিন্ন উপাদান ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা, শ্রমিকগণ ঠিকমত কাজ করছে কিনা তার তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করতে হয়, যাতে কোন ফাঁকি দেবার সুযোগ না পায় এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

৪) **ঝুঁকি বহন :** উদ্যোক্তা বা সংগঠকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করা। বাজারের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে পণ্যের ধরন ও পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয়। যে কোন পণ্য উৎপাদনের জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়। যদি এই সময়ের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তবে লোকসান হতে পারে বা লাভ হতে পারে। চাহিদা বেড়ে গেলে, পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাবে এবং সংগঠকের মুনাফার পরিমাণ বেড়ে যাবে। কিন্তু যদি পণ্যের চাহিদা হ্রাস পায় তাহলে এর মূল্য কমে যাবে এবং ফলে লোকসান হতে পারে। ব্যবসায়ের এই লাভ ক্ষতি সংগঠককেই বহন করতে হয়। এজন্য তাকে সকল সময় বাজারের অবস্থা সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। বর্তমানে উৎপাদন ব্যবস্থা জটিলতর। তাছাড়া মানুষের অভ্যাস, রুচি, বাজারের অবস্থা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। এ কারণে উৎপাদন ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এবং উদ্যোক্তাকেই এটা বহন করতে হয়।

৫) **অন্যান্য উৎপাদনের পারিশ্রমিক প্রদান :** উৎপাদনে নিয়োজিত সকল উপাদানগুলির পারিশ্রমিক প্রদান করা উদ্যোক্তার কাজ। ভূমি, শ্রম ও মূলধনের সহযোগিতায় যে একটি পণ্য উৎপাদিত হয় তা বিক্রি করে সংগঠকের আয় হয়। এই আয় থেকে ভূমির জন্য খাজনা, শ্রমিকের জন্য মজুরী ও মূলধনের জন্য সুদ প্রদান করার পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাই সংগঠকের আয়। ফলে এখানে লাভের ও লোকসানের উভয়েরই আশঙ্কা থাকে।

৬) **নতুনত্ব প্রবর্তন :** অর্থনীতিবিদ জে. বি. ক্লার্কের মতে উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হ'ল নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন এবং এর প্রবর্তন করা। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে উদ্যোক্তা নতুন নতুন যন্ত্র, উন্নত কলাকৌশল, নতুন নিয়মকানুন বা পদ্ধতি প্রবর্তন করতে সচেষ্ট থাকে। ফলে কখনো কখনো ব্যয় হ্রাস পায় এবং মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি

পায়। এভাবে উদ্যোক্তা নতুন কলাকৌশলের প্রবর্তন করে উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনয়ন করে।

সুতরাং আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্যোক্তার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য যৌথ মূলধনী কারবার গড়ে উঠার ফলে উদ্যোক্তার কার্যাবলীতে কিছু পরিবর্তন এসেছে। যৌথ মূলধনী কারবারের প্রকৃত মালিক হ'ল শেয়ার হোল্ডারগণ। তাদের পক্ষ থেকে ম্যানেজার ব্যবসা পরিচালনা করেন, তবে তিনি ঝুঁকি গ্রহণ করেন না। তাই কোন কোন অর্থনীতিবিদের মতে সংগঠনকারীই হল আর্থিক উন্নয়নের অগ্রদূত। মার্শাল এদেরকে শিল্পের চালক (Captain of the Industry) হিসেবে অভিহিত করেছেন।

ব্যবসায় সংগঠনের বিভিন্ন রূপ

অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে পৃথিবীতে নানা প্রকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন গড়ে উঠেছে। এগুলোকে ৫টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যথা; (১) এক-মালিকানা কারবার, (২) অংশীদারী কারবার, (৩) যৌথ মূলধনী কারবার, (৪) সমবায় কারবার এবং (৫) রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী কারবার।

(১) **একক বা এক মালিকানা কারবার :** যে কারবারে একজন মাত্র মালিক থাকেন, নিজেই ব্যবসায় উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন এবং এর লাভ-লোকসানের জন্য তিনি দায়ী থাকেন, তাকে এক মালিকানা কারবার বলা হয়। ব্যবসায়ে অতিপ্রাচীন কাল থেকে এক মালিকানা কারবার প্রচলিত আছে। তাই আদি রূপ হল একক বা এক মালিকানা কারবার। শিল্প বিপ্লবের বহু আগে থেকেই এ ধরনের কারবার প্রচলিত আছে।

এক মালিকানা কারবারে মালিক নিজেই মূলধন সংগ্রহ করে, ব্যবসা পরিচালনা করে, ব্যবসায়ের লাভ-লোকসানের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে বহন করে।

এক মালিকানা কারবারের সুবিধা

ক. **দক্ষ পরিচালনা :** একমালিকানা কারবারে মালিক নিজেই আগ্রহ সহকারে ব্যবসায়ের কার্যকলাপ পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করেন। ব্যবসায়ে লাভ হলে সেটা একমাত্র তারই প্রাপ্য এবং লোকসান হলেও তাকেই বহন করতে হবে। তাই তিনি সকল প্রকার অপচয় রোধ করতে সচেষ্ট থাকেন এবং ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তিনি বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে, অধিক যত্ন নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে লাভের পরিমাণ সর্বাধিক করার চেষ্টা করেন।

খ. **দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** এক-মালিকানা কারবারের মালিক ও পরিচালক একই ব্যক্তি তাই যে কোন ব্যাপারে তিনি দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন। তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কারো মুখাপেক্ষী থাকতে হয় না। তাই সংকট নিরসনে তিনি অতি দ্রুত নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

গ. **ভোক্তার রুচি অনুযায়ী উৎপাদনে পরিবর্তন আনয়ন :** এক-মালিকানা কারবার সাধারণতঃ ক্ষুদ্রায়তনের হয়ে থাকে। তাই মালিক ভোক্তাগণের সংস্পর্শে এসে তাদের রুচি ও পছন্দ-অপছন্দ জানতে পারেন এবং লোকের রুচি অনুসারে পণ্য উৎপাদন করতে পারেন। ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন করে মালিক ব্যবসায়ে অধিক মুনাফা অর্জনে সক্ষম হন।

ঘ. **অপচয় কম :** এক-মালিকানা কারবারে শ্রম, কাঁচামাল, বিদ্যুত প্রভৃতি উপাদানের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করে অপচয় রোধ করতে পারে। যেহেতু মালিক নিজেই তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করেন তাই অপচয় রোধ করতে চেষ্টা করেন।

ঙ. **উৎকৃষ্ট উৎপাদন :** এক-মালিকানা কারবারে মালিক উৎপাদনের প্রতি নজর দিতে পারেন। ভোক্তাদের রুচি মাফিক যেখানে যে পরিবর্তন করে উৎকৃষ্ট মান বজায় রাখা যায় তা করতে পারেন। এভাবে মালিক ভোক্তার সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট উৎপাদন সম্ভব হয়।

চ. **মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক :** এক-মালিকানা কারবারে মালিক শ্রমিকের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে এবং একে অপরের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন। অসুবিধা দূরীকরণে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়। শ্রমিক মালিকের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

ছ. **উৎসাহ ও উদ্দীপনা :** এক-মালিকানা কারবারে ব্যবসায়ের সকল মুনাফা মালিক ভোগ করেন। এর ফলে ব্যবসায়ে সাফল্যের জন্য যে উদ্দীপনা, উৎসাহ ও আন্তরিকতা প্রয়োজন তা বিদ্যমান থাকে যা ব্যবসায়ের উন্নতি ত্বরান্বিত করে।

জ. **ব্যবসায়ের গোপনীয়তা :** এক-মালিকানা কারবারে মালিক সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ একাই সম্পাদন করেন তাই ব্যবসায়ের গোপন তথ্য কেউ সহজে জানতে পারে না। ব্যবসায়ের এরূপ গোপনীয়তা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সহায়তা প্রদান করে।

এক মালিকানা কারবারের অসুবিধা

ক. **মূলধনের স্বল্পতা :** আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হয়। এক মালিকানা কারবারে একজনের পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় না। এক-মালিকানা কারবারের মালিক যতই ধনী হউক, তিনি ঝুঁকি নিয়ে বেশি মূলধন এক কারবারে নিয়োগ করতে চান না।

খ. **ঝুঁকির আধিক্য :** এক-মালিকানা কারবারে অন্যতম অসুবিধা এই যে, যে কোন একজনের পক্ষে সব ঝুঁকি গ্রহণ খুবই বিপজ্জনক। যদি ব্যবসায়ে লোকসান হয়, তবে মালিককে দেউলিয়া হতে হয়। ব্যসায়ের ঋণের জন্য পাওনাদার মালিকের সম্পত্তি, ঘর-বাড়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সব কিছু নিয়ে যেতে পারে।

গ. **বৃহদায়তন উৎপাদনের অন্তরায় :** এক-মালিকানা কারবারে একজন মালিকের আর্থিক শক্তি সীমাবদ্ধ বলে তার পক্ষে বৃহদায়তন উৎপাদনে যাওয়া সম্ভবপর হয় না। তাই সাধারণতঃ এক-মালিকানা কারবার ক্ষুদ্রাকার। ফলে বৃহদায়তন শিল্পের যে সুবিধা তাও গ্রহণ করতে পারে না।

ঘ. **উৎপাদন ব্যয় অধিক :** এক-মালিকানা কারবারের আয়তন ক্ষুদ্রাকার হয় বিধায় উৎপাদন ব্যয় অধিক হয়। এরূপ সংগঠন প্রতিযোগিতায় বৃহদায়তন উৎপাদনকারীগণের সাথে কেটে উঠতে পারে না; অনেক সময় তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে।

ঙ. **স্বল্প অস্তিত্ব :** এক-মালিকানা কারবারের মালিকের মৃত্যুতে বা প্রতিকূল অবস্থার কারণে স্থায়িত্ব স্বল্প সময়ের জন্য। মালিকের অনুপস্থিতিতে বা অযোগ্য উত্তরাধিকারের হাতে পড়ে কারবার বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

চ. **অপর্যাপ্ত তত্ত্বাবধান :** এক-মালিকানায় কারবারে মালিক যত দক্ষই হউন না কেন, উৎপাদনের সকল পর্যায়ে ও দিকে নজর রাখা তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। এই অপর্যাপ্ত তত্ত্বাবধানের ফলে ব্যবসায়ে বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে।

অংশীদারী কারবার

যে কারবারে পরস্পরের সাথে পরিচিত কয়েকজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে মূলধন সংগ্রহ করে যুক্তভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে তাকে অংশীদারী কারবার বলা হয়। অংশীদারীগণ একক এবং যৌথভাবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য এবং ব্যবসায়ের ঋণের জন্য দায়ী থাকে। অংশীদারী কারবারে সকলের সমান অংশীদারী হবার প্রয়োজন নেই। তাঁরা নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে এর ভিত্তিতে বা শর্ত অনুযায়ী মূলধন দিয়ে থাকে এবং সেই অনুসারে লভ্যাংশ পেয়ে থাকে। এই কারবারের তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে: (ক) অংশীদারীগণ সকলেই যুক্তভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে, (খ) অংশীদারগণের দায়িত্ব অসীম এবং (গ) অংশীদারগণের মধ্য থেকে কেউ মারা গেলে, পাগল হয়ে গেলে বা দেউলিয়া হয়ে গেলে এ ধরনের কারবার বন্ধ হয়ে যায়; ফলে এর স্থায়ীত্ব খুব কম। এরূপ কারবারে পাওনাদারগণ ইচ্ছা করলে যে কোন অংশীদারের কাছ থেকে সমস্ত ঋণের টাকা আইনত: আদায় করতে পারে। উল্লেখ্য যে অংশীদারদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে এ ধরনের সংগঠন কাজ করে।

অংশীদারী কারবারের সুবিধাসমূহ

ক. **গঠনের সুবিধা :** অংশীদারী কারবার গঠনে আইনগত কোনরূপ বাধ্যবাধকতা নেই; ফলে সহজেই এ ধরনের কারবার গড়ে তোলা যায়।

খ. **মূলধনের পর্যাপ্ততা :** অংশীদারী কারবারের সকল অংশীদারগণ মূলধনের যোগান দেন, তাই ব্যক্তিগত কারবারের তুলনায় সকলের সমবেত চেষ্টায় পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয় যা দিয়ে বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায়। এতে ব্যবসায়ী ও ভোক্তা উভয়েরই সুবিধা হয়।

গ. **অসীম দায়িত্ব ও ঋণের সুবিধা :** অংশীদারী ব্যবসায় অংশীদারগণ একক ও সম্মিলিতভাবে ব্যবসায়ের অসীম দায়ভার বহন করে বলে অংশীদারী কারবারে সহজে ঋণ পাওয়া যায়।

ঘ. **শ্রম বিভাগের সুবিধা :** এ ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তির সমাবেশ ঘটতে পারে। তাদের দক্ষতা অনুযায়ী ব্যবসায়ের কাজ ভাগ করে দেওয়া যায়। যেমন – কেহ ব্যবসা পরিকল্পনা, কেহ উৎপাদন কাজ, কেহ বাজারজাত করণের কাজ, কেহ প্রশাসন প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করলে গোটা ব্যবসা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হতে পারে।

ঙ. **অধিক গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত :** অংশীদারগণের আলাপ অলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এজন্য অধিকতর নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত এবং নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়।

চ. **ব্যবসায়ের সুনাম ও দক্ষতা :** অংশীদারী কারবারে প্রত্যেক অংশীদারগণ তাদের দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করে। এজন্য ব্যবসায়ের সুনাম ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং অধিক মুনাফা অর্জনের পথ সুগম করে।

ছ. **স্থিতিস্থাপকতা :** এ ধরনের কারবারে প্রয়োজনে অংশীদারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। বিশেষ করে ব্যবসা সম্প্রসারণের তাগিদে নতুন অংশীদার গ্রহণ করা যায়।

অংশীদার কারবারের অসুবিধা

ক. **অসীম দায়িত্ব :** অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণের অসীম দায়িত্ব এ ব্যবসায়ের প্রধান অসুবিধা। যদি ব্যবসায়ে লোকসান হয় তাহলে ঋণদাতা যে কোন অংশীদারের কাছ থেকে ঋণের সমস্তটাই আইনগতভাবে আদায় করতে পারে। অনেক সময় কোন অংশীদার কেবল তার মূলধন হারায় তাই নয় তার যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিও হারাতে পারে। সুতরাং এ ব্যবসায়ের ঝুঁকি অসীম।

খ. **স্থায়ীত্বের অভাব :** অংশীদারী কারবারের স্থায়ীত্ব কম। কোন অংশীদার মারা গেলে, উন্মাদ বা দেউলিয়া হলে আইনগতভাবে কারবার বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে বর্তমানে অংশীদারী কারবার সীমিত হয়ে পড়েছে এবং বর্তমানে যেগুলি আছে তা বিলুপ্ত হবার পথে।

গ. **অপ্রচুর মূলধন :** অংশীদারী কারবারে যদিও এক-মালিকানা কারবারের তুলনায় বেশি মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব, তথাপিও বতর্মানে বৃহদায়তন শিল্পের মূলধনের প্রয়োজনে অপর্যাপ্ত। মূলধনের অপর্যাপ্ততার জন্য এ ধরনের কারবার ক্রমশ: অপ্রিয় হয়ে পড়ছে।

ঘ. **মতানৈক্য :** অংশীদারগণের মধ্যে যে কোন কারণে মত বিরোধ দেখা দিতে পারে। তার ফলে ব্যসায়ের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে বা কখনো কখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসুবিধা হতে পারে।

ঙ. **অদক্ষতা অংশীদার :** অংশীদারী কারবারে সকল অংশীদার সমযোগ্যতা সম্পন্ন নাও হতে পারে। ফলে এমন হতে পারে যে, একজন অংশীদারের অদক্ষতা গোটা ব্যবসাকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিতে পারে এবং এর দায়ভার সকলকে নিতে হতে পারে।

যৌথ মূলধনী কারবার

বর্তমানকালে বৃহদায়তন উৎপাদনের যুগ। তাই যুগোপযোগী কারবার সংগঠন হ'ল যৌথ মূলধনী কারবার যেখানে অনেকগুলি লোক সম্মিলিতভাবে মূলধন যোগান দিতে পারে। প্রায় সকল দেশেই যৌথ মূলধনী কারবারের প্রচলন রয়েছে। যৌথ মূলধনী কারবারের মূলধনকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে সেগুলোকে এক একটি শেয়ার বলা হয়।

যৌথ মূলধনী কারবার গঠন প্রণালী ও মূলধন সংগ্রহ পদ্ধতি

কারবারের উদ্যোক্তাগণ কোম্পানির নাম, উদ্দেশ্য, মূলধনের পরিমাণ প্রভৃতি সংক্রান্ত স্মারকলিপি (Article of Memorandum) জনসাধারণের কাছে প্রচার করে। তারপর এসব সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে নিয়ে ব্যবসায়ের কাজ শুরু করে। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান সব সময় অনুমোদিত মূলধনের সবটুকু শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করে না। অনুমোদিত মূলধনের যে পরিমাণ মূল্যের শেয়ার বাজারে বিক্রির জন্য ছাড়া হয় তাকে ইস্যু মূলধন (Subrcribed capital) বলে। বিক্রীত মূলধনের যে অংশ শেয়ার ক্রেতাদের থেকে নগদে আদায় করা হয়েছে তাকে আদায়ীকৃত মূলধন (Paid up Capital) বলে।

যৌথমূলধনী কারবার সাধারণতঃ তিন উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করে থাকে। যথা –(১) শেয়ার বিক্রি করে, (২) ঋণপত্র (Debenture) বিক্রি করে এবং (৩) ঋণ গ্রহণ করে।

১. শেয়ার বিক্রয়

শেয়ার বিক্রয়ই যৌথমূলধনী কারবারের মূলধন সংগ্রহের সবচেয়ে বড় উপায়। শেয়ার প্রধানত: দু'প্রকার - (ক) অগ্রগণ্য শেয়ার ও (খ) সাধারণ শেয়ার।

ক. **অগ্রগণ্য শেয়ার :** ব্যবসায়ের মুনাফা থেকে যে শেয়ারের প্রাপ্য সর্বপ্রথম মিটিয়ে দেয়া হয় তাকে অগ্রগণ্য শেয়ার বলা হয়। অগ্রগণ্য শেয়ারের লভ্যাংশ নির্দিষ্ট। ব্যবসায়ের মুনাফা না হলে সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের মত কিছুই পায় না। যদি এ প্রকার শেয়ার ক্রমবর্ধমানশীল অগ্রগণ্য শেয়ার (Cumulative preferential share) হয় তবে যখনই কোম্পানির মুনাফা হবে তখনই পূর্ববর্তী এবং বর্তমান বৎসরের মুনাফা নির্দিষ্ট হারে একই সঙ্গে বুঝে পাবে। এ ধরনের শেয়ার কম ঝুঁকি বহুল।

খ. **সাধারণ শেয়ার :** সাধারণ শেয়ারের মুনাফা নির্দিষ্ট থাকে না। অন্যান্য সকলের পাওনা মিটাবার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই সাধারণ শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে বন্টিত হয়। মুনাফার পরিমাণ বেশি হলে লভ্যাংশ বেশি এবং মুনাফা কম হলে লভ্যাংশ কম হবে। এমনকি যদি ব্যবসায়ে কোন ক্ষতি হয় তবে ক্ষতিপূরণ সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদেরই করতে হয়। এরূপে তাদেরকে সর্বাপেক্ষা বেশি ঝুঁকি বহন করতে হয়।

২. ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার

ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার বিক্রি করেও যৌথ মূলধনী কারবার মূলধন সংগ্রহ করে। ঋণপত্রের উপর একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করা হয়। ডিবেঞ্চার এক প্রকার বন্ড যাতে কোম্পানির সম্পত্তি জামিন থাকে। প্রয়োজন হলে কোম্পানির সম্পত্তি বিক্রি করেও ডিবেঞ্চার হোল্ডারদের প্রাপ্য পরিশোধ করতে হয়। কারবারের মুনাফার সাথে ডিবেঞ্চারের সম্পর্ক নেই। ডিবেঞ্চার ক্রেতাগণ যৌথমূলধনী কারবারের মালিক নন, তারা কোম্পানির ঋণদাতা। যদি কোন সময় কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায় তবে ডিবেঞ্চার হোল্ডারদের দাবি সর্বপ্রথম মিটাতে হয়।

৩. ঋণ গ্রহণ

যৌথ মূলধনী কারবারে চলতি মূলধনের জন্য ব্যাংক ও অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করতে পারে।

যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

১. **বৃহদায়তন উৎপাদন :** যৌথ মূলধনী কারবারের ফলে বৃহদায়তন উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। বৃহদায়তন উৎপাদনে যে প্রচুর পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন হয় তা যৌথ মূলধনী কারবারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। ফলে এই প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয় সংকোচের সুবিধা ভোগ করতে পারে।

২. **মূলধনের আধিক্য :** যৌথ মূলধনী কারবারে নানা প্রকার অল্প মূল্যের শেয়ার, ঋণপত্র ধনী-দরিদ্র সকলের মধ্যে বিক্রি করে মূলধন গড়ে তোলা যায়। ফলে যাদের অল্প সঞ্চয় আছে তারাও সাধ্যানুযায়ী ব্যবসায়ে অংশ নিতে পারে। এভাবে বিরাট পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ সম্ভবপর হয়।

৩. **প্রতিভা ও মূলধনের সমন্বয় :** সমাজে অনেক বিত্তশালী ব্যক্তি আছেন যাদের ব্যবসায়িক আকাংক্ষা বা কর্মকুশলতা নেই। অপরপক্ষে, ব্যবসায়ের বুদ্ধি সম্পন্ন অনেক প্রতিভাধর ব্যক্তি আছেন যাদের প্রয়োজনীয় মূলধন নেই। যৌথমূলধনী কারবার এই দু'শ্রেণীর লোকের মধ্যে একটি সেতুবন্ধ সৃষ্টি করে এবং উভয়ের যৌথ প্রয়াসকে সাফল্য মন্ডিত করে তোলে।

৪. **স্থায়িত্ব :** স্থায়ীত্ব যৌথ কারবারের একটি অন্যতম সুবিধা। এক মালিকানা বা অংশীদারী কারবারের মত কারো মৃত্যু ঘটলে বা উন্মাদ হয়ে গেলে যেমন ব্যবসা অচল হয়ে পড়ে, যৌথ মূলধনী কারবারে এরূপ কোন ক্ষতি হয় না। পুরাতন অংশীদারগণ তাদের শেয়ার বিক্রি করে প্রতিষ্ঠান যেমন ত্যাগ করতে পারে, তেমনি নতুন অংশীদার কারবারে যোগদান করতে পারে। ফলে কারবারের ধারা অব্যাহত থাকে।

৫. **সীমাবদ্ধ দায়:** যৌথ মূলধনী কারবারে অংশীদারগণের দায় সীমাবদ্ধ। কোন কারণবশতঃ এ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্য বন্ধ হয়ে গেলেও অংশীদারগণ এর ঋণদাতাদের কাছে শেয়ারের আনুপাতিক পরিমাণ ঋণের জন্য দায়ী থাকবে। এ কারণে বিনিয়োগকারীগণ এরূপ প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হয়।

৬. **সঞ্চয় ও বিনিয়োগ :** যৌথ মূলধনী কারবার সাধারণ লোককে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ করতে সুযোগ ও উৎসাহ যোগায়। তাদের সামান্য সঞ্চয় দিয়ে এ ধরনের সংগঠনের অল্প মূল্যের শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয়ের মধ্য দিয়ে তারা ব্যবসায়ে অংশ নিতে পারে এবং মুনাফা ভোগ করতে পারে।

৭. **শেয়ারের হস্তান্তরযোগ্যতা :** যৌথমূলধনী কারবারের শেয়ারগুলি হস্তান্তরযোগ্য এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ার যোগ্য। এ ব্যবস্থা কারবারটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। বিনিয়োগকারীগণ প্রয়োজনবোধে শেয়ার বিক্রি করে টাকা ফেরত পেতে পারে।

৮. **ঝুঁকির শ্রেণী বিভাগ :** যৌথমূলধনী কারবারে বিভিন্ন শ্রেণী ঝুঁকিসম্বলিত শেয়ার থাকে। বিনিয়োগকারীগণের মধ্যে যে যেমন ঝুঁকি গ্রহণে ইচ্ছুক সেরূপ শেয়ার ক্রয় করতে পারে।

৯. **সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিচালনা :** যৌথমূলধনী কারবারে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ পরিচালকগণের সমাবেশ ঘটিয়ে ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। প্রয়োজনবোধে পুরাতন পরিচালক পরিবর্তন করে নতুন পরিচালকমন্ডলীর সদস্য নিয়োগ করা যায় এবং পরিচালনায় গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণের মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের অধিকতর আস্থা অর্জন করা সম্ভব।

১০. **লোকের আস্থা :** যৌথমূলধনী কারবার দেশের আইন দ্বারা সৃষ্ট সংগঠন। কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। সুতরাং এ ধরনের কারবারে মানুষের আস্থার পরিমাণ বেশী।

যৌথমূলধনী কারবারের অসুবিধা

যৌথমূলধনী কারবারের অনেকগুলি অসুবিধা আছে। এগুলি নিম্নে আলোচিত হল ঃ

১. **অংশীদার এবং পরিচালকদের মধ্যে সংযোগের অভাব :** যৌথমূলধনী কারবারের শেয়ারহোল্ডার সংখ্যা অগণিত এবং তাদের অংশগুলি আবার হস্তান্তরযোগ্য। কারবারের পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিতদের সাথে অংশীদারদের কোন সম্পর্ক বা যোগাযোগ থাকে না। কখনো কখনো পরিচালকগণ নিজ স্বার্থে নানান ধরনের অসদুপায় অবলম্বন করে এবং অংশীদারগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

২. **সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অপচয় :** যৌথমূলধনী কারবারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদনার দায়িত্ব থাকে বেতনভুক কর্মচারীদের উপর। তাদের সততা ও আন্তরিকতার অভাবে ব্যবসা সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না। এই সাংগঠনিক দুর্বলতা দক্ষ পরিচালনার পথে একটি অন্তরায়। ফলে অপচয় হয়।

৩. **সংগঠন জটিলতা :** এ ধরনের কারবারে গঠন-প্রণালী খুবই জটিল। অনেক আইনগত ঝামেলা পোহাতে হয় বলে সাধারণ লোক শেয়ারহোল্ডার হতে আগ্রহী নয়।

৪. **শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক :** যৌথমূলধনী কারবারের শ্রমিক মালিক সম্পর্ক সবসময় ভাল থাকে না। উভয়ের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা বেশী। ফলে ধর্মঘট, লক-আউট, শ্রমিক সংঘর্ষ প্রভৃতি কারবারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

৫. **অসাধু লোকের হাতে পরিচালনার দায়িত্ব যাবার সম্ভাবনা :** অনেক সময় কারবারের দায়িত্ব অসাধু ও অনভিজ্ঞ ডিরেক্টরদের হাতে চলে যায়। দলীয়করণ, কোন্দল ও কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে অসাধু লোক প্রভাব ও প্রতিপত্তি খাটায়। যার ফলে কোম্পানি বিপদের সম্মুখীন হয়।

৬. **ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ :** যৌথমূলধনী কারবারের গণতান্ত্রিক পরিচালনার কথা বলা হলেও কার্যতঃ সেখানে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ লক্ষণীয়। কতিপয় শেয়ারহোল্ডার বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন নামে মোট শেয়ারের বৃহৎ অংশের মালিকানা অর্জন করে এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ামক

হয়ে উঠে এবং নিজেদের স্বার্থে প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে। সুতরাং সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়ে। বস্তুত: অগণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

৭. **শেয়ারের ফটকা ব্যবস্থা ঃ** যেহেতু যৌথমূলধনী কারবারে শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য এবং এধরনের প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়। এই সুযোগ অসাধু ও চতুর লোক শেয়ার বাজারে ফটকা ব্যবসায়ে জেঁকে বসে। যখন মুনাফার সম্ভাবনা বেশি তখন তারা নিজেরা অধিক সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করে কিন্তু যখন লোকসানের আভাস পায় তখন জনসাধারণকে লোভ দেখিয়ে তাদের কাছে শেয়ার বিক্রি করে। ফলে নিরীহ শেয়ারহোল্ডারগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৮. **দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি ঃ** যৌথমূলধনী কারবারে অনেক সময় দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি দেখা যায়। পরিচালকগণ তাদের আত্মীয়-স্বজনদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছাড়াই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগ করে। এ ধরনের কাজের ফলে কারবারের দক্ষতার হানি হয় এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়।

৯. **ক্ষতির সম্ভাবনা ঃ** যৌথমূলধনী কারবারে শেয়ারহোল্ডার বা বিনিয়োগকারীগণ প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অসাধু ও অযোগ্য ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কারবারে অর্থ বিনিয়োগ করে ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

১০. **সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট ঃ** এ ধরনের কারবারে মুষ্টিমেয় বিত্তশালী শেয়ারহোল্ডারগণ কারবারের নিয়ন্ত্রণ কুক্ষিগত করে। মুষ্টিমেয় লোকের মালিকানায় সম্পদ যায় বলে ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পায় ও সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়।

উপসংহারে বলা যায় যে, এ সকল অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও যৌথমূলধনী কারবারের সুবিধা অনেক বেশি ; এ জন্য এ ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। বর্তমান যুগে এধরনের ব্যবসাই অধিক গড়ে উঠেছে - তাদের সংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

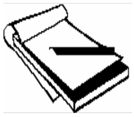

অনুশীলনী ৮.৫

১. সংগঠন কি? সংগঠকের গুরুত্ব ও কার্যাবলী বর্ণনা করুন।
২. ব্যবসায় সংগঠনের বিভিন্ন রূপ বর্ণনা করুন।
৩. একক মালিকানা ব্যবসায় সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করুন।

পাঠ-৬ : উৎপাদন অপেক্ষক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- উৎপাদন-অপেক্ষক বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- উৎপাদন-অপেক্ষকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

উৎপাদন অপেক্ষক (Production Function)

কোন একটি পণ্যের উৎপাদন কিছু উপকরণে উপর নির্ভর করে। উৎপাদনের পরিমাণের সাথে উপকরণের পরিমাণের কারিগরী সম্পর্ককেই বলা হয় উৎপাদন অপেক্ষক। যেমন যদি এ ক্ষেত্রে X কে (X দব্যের উৎপাদন Y উপকরণের উপর নির্ভরশীল হয়) Y এর অপেক্ষক বলে বীজগণিতে যেভাবে প্রকাশ করা হয় তাহলো ঃ $X = f(Y)$

যেকোন উৎপাদনকারীর মূল লক্ষ্য হল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা এবং এলক্ষ্যে সর্বনিম্ন খরচে উৎপাদন করা। তাই উৎপাদনকারীকে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কাম্য অনুপাত স্থির করে সর্বনিম্ন খরচে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করতে হয়। সুতরাং প্রত্যেক উৎপাদনকারীকে দু'টি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়- (ক) উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের কি করে সর্বনিম্ন ব্যয়ে উৎপাদন সম্ভব হয় এবং (খ) সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। এজন্য প্রত্যেক উৎপাদন প্রতিষ্ঠানকে দু'টি বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত নিতে হয়। যথা– কারিগরি এবং অর্থনৈতিক তথ্য উপর নির্ভর করে। সুতরাং কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত উপাদানসমূহ এবং উৎপাদনের পরিমাণের মধ্যে যে ক্রিয়াগত সম্পর্ক বিদ্যমান তাকে উৎপাদন অপেক্ষক বলে। অন্যকথায়, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদনের পরিমাণের মধ্যে কারিগরি সর্ম্পকের এই সূত্রকে উৎপাদন অপেক্ষক বলে। অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণের পরিমাণের বিভিন্ন সমন্বয় দ্বারা বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব তা যে কারিগরি সম্পর্ক দ্বারা জানা যায় তাকে উৎপাদন অপেক্ষক বলে। উৎপাদনের পরিমাণের সাথে উপাদান-সমষ্টির এই ক্রিয়াগত সম্পর্কটি বুঝাবার জন্যই উৎপাদন অপেক্ষক কথাটি ব্যবহার করা হয়। Professor Leontief এর মতে "A Production function is a description of the quantitative relation between the inputs absorbed and the output energing from a particular production process." অর্থাৎ 'কোন একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ এবং উৎপাদনের পরিমাণের কার্যগত সম্পর্কই উৎপাদন অপেক্ষক।' যদি উপকরণগুলি X, Y, Z হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ Q হয় তাহলে এক্ষেত্রে উৎপাদন অপেক্ষক হল $Q = f(X,Y,Z)$। এই সমীকরণ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হলে উপাদানসমূহের অনুপাতের পরিবর্তন প্রয়োজন অথবা যে অনুপাতে উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে তা অক্ষুন্ন রেখে সবগুলি উপাদানের নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। সুতরাং উৎপাদনের উপাদানসমূহ এবং উৎপাদিক দ্রব্যের পরিমাণের মধ্যে ক্রিয়াগত সম্পর্ককে উৎপাদন অপেক্ষক বলা হয়। অর্থনীতিবিদ স্যামুয়েলসন বলেন, "উৎপাদনের উপাদানসমূহের প্রত্যেক এবং নির্দিষ্ট পরিমাণের সমন্বয়ে যে উৎপাদন সম্ভব হয় তা যে কারিগরি সম্পর্ক থেকে জানা যায় তাকেই উৎপাদন অপেক্ষক বলে। (Production function is the technical relationship telling the amount of output capable of being produced by each and every set of specified inputs.
– Samuelson)"

উৎপাদন অপেক্ষকের গুরুত্ব

যে কোন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের কাছে উৎপাদন অপেক্ষক ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে লিপ্ত বিভিন্ন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান সর্বনিম্ন খরচে উৎপাদনে সচেষ্ট থাকে। তাই উৎপাদনের সাথে উৎপাদন খরচের বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদন-ব্যয় সর্বনিম্ন করতে হলে সর্বাধিক দক্ষ উৎপাদন-অপেক্ষক এবং উপকরণের সংমিশ্রণের সমন্বয়ে উৎপাদনকার্য পরিচালনা করা প্রয়োজন। তাই প্রত্যেক উৎপাদনকারী সর্বদাই সর্বাধিক দক্ষ উৎপাদন-অপেক্ষকের অনুসন্ধানে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই সে দামী উপাদানগুলো কম পরিমাণে এবং তুলনামূলকভাবে সস্তা উপাদানগুলো অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে। প্রয়োজনে একটি উপাদানের পরিমাণ স্থির রেখে অন্যগুলো অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে। এধরনের প্রয়াসের একটিই উদ্দেশ্য তা হ'ল উৎপাদন ব্যয় সর্বনিম্ন রাখা।

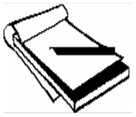

অনুশীলনী ৮.৬

১. উৎপাদন অপেক্ষক কি? উৎপাদন অপেক্ষকের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

পাঠ ৭ : একটি পরিবর্তনীয় উপকরণঃ ক্রমহ্রাসমান, ক্রমবর্ধমান ও সমানুপাতিক উৎপাদন বিধি।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উৎপাদন বিধি বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির ব্যতিক্রম কি কি তা বলতে পারবেন।
- ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা বলতে পারবেন।
- ক্রমবর্ধমান এবং সমানুপাতিক উৎপাদন বিধি ব্যাখা করতে পারবেন।

কোন দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে উৎপাদনের উপাদানসমূহ যথা– ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনের প্রয়োজন। উৎপাদনকারী যখন উৎপাদন বাড়াতে চায় তখন উপকরণের পরিমাণও বাড়াতে হবে। কিন্তু দ্রব্যের উৎপাদন সকল ক্ষেত্রে উপকরণ ব্যবহারের অনুপাতে বৃদ্ধি পায়না। উৎপাদনের পরিমাণ কখনও কম হারে বাড়ে, আবার কখনো সমহারে বাড়ে। উপকরণের নিয়োগ বৃদ্ধির সাথে উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নিয়মগুলোকেই বলা হয় উৎপাদন বিধি। উৎপাদন বিধিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন –

(১) ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি,

(২) ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি এবং

(৩) সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি (Law of Diminishing Return)

অন্যান্য উপকরণকে স্থির রেখে কোন একটি উপকরণের নিয়োগ বাড়াতে থাকলে একটি পর্যায়ের পরে অতিরিক্ত প্রতিটি একক থেকে প্রাপ্তির হার বা উৎপাদনের হার হ্রাস পেতে থাকে – এটাকেই বলা হয় ক্রমহ্রাসমান প্রান্তির উৎপাদন বিধি। যেমন জমিতে ক্রমাগতভাবে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা শ্রম ও মূলধন যে হারে বৃদ্ধি পায় উৎপাদন সে তুলনায় কম হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন এবং গড় উৎপাদন ক্রমশ: হ্রাস পায়। এই বিধি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি নামে পরিচিত। অধ্যাপক মার্শালের সংজ্ঞা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার ভাষায় - “An increase in capital and labour applied in the cultivation of land causes in general a less than proportionate increase in amount of produced raised.” অর্থাৎ- “কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে চাষের জন্য অধিক হারে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করতে থাকলে সাধারণত; আনুপাতিক হার অপেক্ষা কম হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।”

কৃষিক্ষেত্রে যেহেতু জমির যোগান স্থির অথচ লোকসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলছে তাই প্রাচীন অর্থনীতিবিদগণ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক বিধিটি কৃষিক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য মনে করতেন। বর্ধিত জনগোষ্ঠির জন্য খাদ্যের যোগান দিতে একই জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয়। ফলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, কিন্তু শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির আনুপাতিক হারের চেয়ে কম হারে। অর্থাৎ খরচের তুলনায় উৎপাদন ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। উৎপাদন

বিধির এই নিয়মকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। নিম্নে এই বিধিটি একটি তালিকার সাহায্যে প্রদর্শন করা হ'ল ঃ

তালিকা

জমির পরিমাণ	শ্রম ও মূলধন (টাকায়)	মোট উৎপাদন	গড় উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ একর	১০০০.০০	২০ কুইন্টাল	২০ কুইন্টাল	২০ কুইন্টাল
১ একর	২০০০.০০	৪৪ ”	২২ ”	২৪ ”
১ একর	৩০০০.০০	৫৭ ”	১৯ ”	১৩ ”
১ একর	৪০০০.০০	৬৮ ”	১৭ ”	১১ ”

উপরিউক্ত তালিকার উদাহরণে দেখা যাচ্ছে যে, এক একর জমিতে ১০০০ টাকার সমান শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে ২০ কুইন্টাল ধান উৎপাদিত হয়। যেহেতু প্রথম একক শ্রম ও মূলধন নিয়োজিত তাই প্রান্তিক ও গড় উৎপাদনও ২০ কুইন্টাল। ঐ একই জমিতে ২০০০ টাকার সমান শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন হয় ৪৪ কুইন্টাল এবং গড় উৎপাদন ২২ কুইন্টাল এবং প্রান্তিক উৎপাদন ২৪ কুইন্টাল। দ্বিতীয়বারে খরচের তুলনায় উৎপাদন বেশি হারে বৃদ্ধির কারণ এই যে পূর্বের তুলনায় জমি ভালভাবে চাষ করা হয়েছে। তৃতীয়বার ঐ একই জমিতে ৩০০০ টাকার সমান শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন হয় ৫৭ কুইন্টাল এবং গড় উৎপাদন ১৯ কুইন্টাল এবং প্রান্তিক উৎপাদন ১৩ কুইন্টাল। এক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ আনুপাতিক হারে কম হয়েছে। চতুর্থবার ঐ একই পরিমাণ জমিতে ৪০০০ টাকার সমান শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৯ কুইন্টাল এবং গড় উৎপাদন ১৭ কুইন্টাল ও প্রান্তিক উৎপাদন ১১ কুইন্টাল। অতএব এ উদাহরণ থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথমদিকে জমির তুলনায় নিয়োজিত শ্রম ও মূলধন কম হবার জন্য দ্বিতীয়বার গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন না কমে বরং কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থবারে দেখা যাচ্ছে যে, মোট উৎপাদন ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমছে। এটাই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি। এই বিধিটি একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হ'ল ঃ

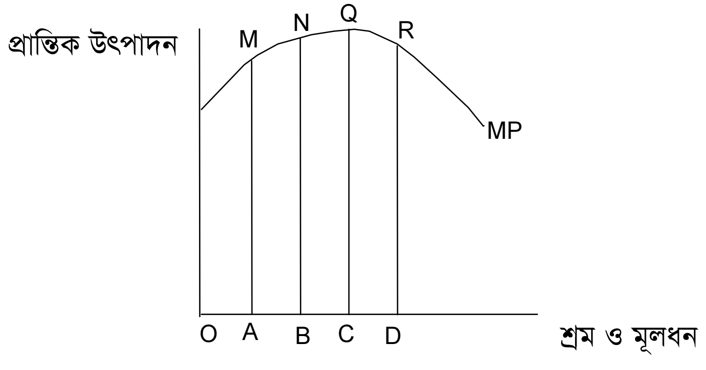

উপরের চিত্রে OX অক্ষরেখায় শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ এবং OY অক্ষরেখায় উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। MP রেখাটি প্রান্তিক উৎপাদন পরিমাণ সূচক। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে যখন OA পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয়, তখন প্রান্তিক উৎপাদন AM এর সমান হয়। যখন B পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয় তখন প্রান্তিক উৎপাদন BN এর সমান হয়। BN AM এর চেয়ে কিছু বেশি। এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে উৎপাদন কিছু বেশি হয়েছে। যখন OC পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয়, তখন প্রান্তিক উৎপাদন দাঁড়ায় CQ পরিমাণ, যা BN থেকে কম। সর্বশেষে যখন শ্রম ও মূলধন OD পরিমাণ বাড়ানো

হয়, তখন প্রান্তিক উৎপাদন দাঁড়ায় RD এর সমান; যা CQ এর চেয়ে কম। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, এই জমিতে যত বেশি শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয় প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশঃহ্রাস পাবে। উৎপাদন বৃদ্ধির এ প্রবণতাকে বলা হয় ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি।

বিধিটির ব্যতিক্রম ঃ

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির ব্যতিক্রমগুলি নিম্নরূপ ঃ

১) **উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে ঃ** উৎপাদনের প্রথম স্তরে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি কার্যকরী নাও হতে পারে। প্রথম দিকে যদি শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ কোন নির্দিষ্ট জমি উত্তমরূপে চাষের জন্য যথেষ্ট না হয় তবে অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ করা হলে প্রান্তিক উৎপাদনহ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেতে পারে।

২) **চাষ পদ্ধতির আধুনিকীকরণ ঃ** ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটির কার্যকারীতা চাষ পদ্ধতির উপরও নির্ভর করে। কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের করে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটির প্রবণতা কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখা যায়। উন্নত ধরনের চাষাবাদ, সেচ, বীজ ও সার ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে না বেড়ে বরং ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেতে পারে।

৩) **প্রাকৃতিক কারণ ঃ** হঠাৎ কোন প্রাকৃতিক কারণে যদি জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় তাহলে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি কার্যকরী হবে না।

৪) **জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ঃ** শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির সাথে সাথে যদি জমির পরিমাণ ও বৃদ্ধি পায়, তবে এ বিধিটি কার্যকরী হবে না।

৫) **সকল উপাদানের একসঙ্গে বৃদ্ধি ঃ** যদি উৎপাদনের সকল উপাদান একই সঙ্গে বৃদ্ধি পায়, তবে এ বিধিটি কার্যকরী হবে না।

উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি কার্যকরী হয় না। সাময়িকভাবে এই বিধিটির কার্যকারীতা স্থগিত থাকতে পারে কিন্তু এমন এক সময় আসবে যে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কৃষিক্ষেত্রে কার্যকরী হবেই – এজন্য এ বিধিটি চূড়ান্ত বিধি।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি শুধুমাত্র কৃষি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি যে কৃষিক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়। তবে বিধিটি যে শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নয়, বরং উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। শিল্প প্রতিষ্ঠান, মৎস্যক্ষেত্র, খনিজক্ষেত্রসহ সকল উৎপাদন ক্ষেত্রেই বিধিটি প্রযোজ্য। নিম্নে এ সকল ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করা হ'ল।

১) **শিল্প ক্ষেত্র ঃ** শিল্প ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকরী হয় তবে প্রথম কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করে অর্থাৎ বিলম্বে। কেননা, শিল্পক্ষেত্রে প্রথমদিকে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকরী হয়ে থাকে। শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির ফলে শিল্প অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সংকোচের সুবিধাসমূহ পেতে পারে। ফলে একক প্রতি উৎপাদন খরচ কমে যায় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি লাভজনক হয়। কিন্তু কোন কারখানার আয়তন সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি করা যায় না। এমতাবস্থায়, একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে না বেড়ে ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়তে থাকবে। সুতরাং দেখা যায় যে, দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্প ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকরী হবে।

২) **খনিজ ক্ষেত্র ঃ** খনিজ ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি প্রযোজ্য। খনিজ পদার্থ যেমন কয়লা, লৌহ ইত্যাদি উত্তোলনের জন্য ক্রমশ: খনির গভীরে যেতে হয় এবং ওর মধ্যে আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু এসব কাজ সম্পন্ন করাতে অনেক ব্যয় হয় এবং উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ব্যয়ের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধির হার কম হয়। এভাবে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধি খনিজ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

৩) **মৎস্য ক্ষেত্রে ঃ** মৎস্যক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকরী হয়ে থাকে। নদী, বিল, পুকুরের মত মৎস্যক্ষেত্রে ইচ্ছা করলেই বেশি মাছ ধরা যায় না। ক্রমাগতভাবে অধিক সংখ্যক মাছ ধরতে হলে বেশি পরিমাণ শ্রম, নৌকা, জাল ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করতে হয়। ফলে ধৃত মৎসের মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু মৎস্য সংগ্রহের হার মোট উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় কম হবে। সুতরাং মৎস্য ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি প্রযোজ্য।

ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি (Law of Increasing Return)

কোন উৎপাদন ক্ষেত্রে বর্ধিত হারে উপকরণ বা শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হলে মোট উৎপাদন যদি শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির হার অপেক্ষা অধিক হারে বৃদ্ধি পায় তাহলে তাকে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলা হয়। এরূপ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা শিল্পক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। শিল্পক্ষেত্রে অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হলে শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুবিধাসমূহ ভোগ করে। শিল্পে অধিক মূলধন নিয়োগ করা হলে দক্ষ উদ্যোক্তা, নিপুণ শ্রমিক, অতি আধুনিক ও উন্নত যন্ত্রপাতির সমাবেশ ঘটানো সম্ভব হয়। এর ফলে উপাদানগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অল্প খরচে ও অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয় এবং উৎপাদনের গড় খরচ হ্রাস পায়। সুতরাং খরচের অনুপাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এই প্রবণতাকে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির একটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হল।

তালিকা

শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপাদন	গড় উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১০০০.০০	২০ কুইন্টাল	২০ কুইন্টাল	২০ কুইন্টাল
২০০০.০০	৬০ ”	৩০ ”	৪০ ”
৩০০০.০০	১২০ ”	৪০ ”	৬০ ”
৪০০০.০০	২৪০ ”	৬০ ”	১২০ ”

উপরের তালিকায় দেখানো হয়েছে যে, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান ১০০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন হয় ২০ কুইন্টাল এবং গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন হয় যথাক্রমে ২০ কুইন্টাল। দ্বিতীয়বার ২০০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হলে তখন মোট উৎপাদন হয় ৬০ কুইন্টাল এবং গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৩০ কুইন্টাল ও ৪০ কুইন্টাল। তৃতীয়বার ৩০০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১২০ কুইন্টাল এবং গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৪০ কুইন্টাল ও ৬০ কুইন্টাল। চতুর্থবার যখন ৪০০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয় তখন মোট উৎপাদন বৃদ্ধি হয়ে দাঁড়ায় ২৪০ কুইন্টাল এবং গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৬০ কুইন্টাল ও ১২০ কুইন্টাল। এভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হলে উৎপাদন খরচের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ উচ্চতর হারে বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন বৃদ্ধির এই প্রবণতাকে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলা হয়।

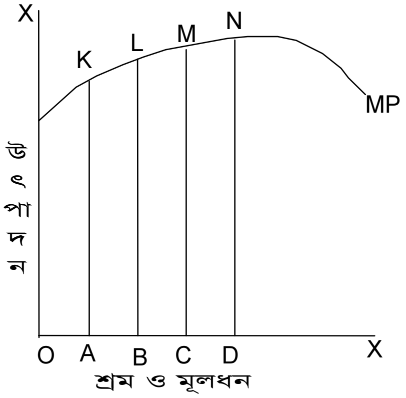

উপরের রেখাচিত্রের সাহায্যে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিধির ব্যাখ্যা দেয়া হ'ল ঃ

চিত্রে OX রেখা শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ এবং OY রেখা উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশ করে। যখন OA পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয়, তখন প্রান্তিক উৎপাদন হয় AK পরিমাণ। যখন আরো একটি অতিরিক্ত একক শ্রম ও মূলধন AB পরিমাণ নিয়োগ করা হয়, তখন প্রান্তিক উৎপাদন BL পরিমাণ হয়। এভাবে যখন অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ CD নিয়োগ করা হয় তখন প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় DN। প্রান্তিক উৎপাদন সূচক রেখা MP উর্দ্ধগামী হয়ে N পর্যন্ত যায়, এরপর অবশ্য নিম্নগামী হয়েছে। ক্রমাগত অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগের ফলে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকরী হয়। এ বিধিটি শিল্পে অধিক প্রযোজ্য। তবে উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিধিটি একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কার্যকরী হয়। তবে এই নির্দিষ্ট সীমার পরে বিধিটি কার্যকরী হয় না।

সমানুপাতিক উৎপাদন বিধি

কোন উৎপাদনক্ষেত্রে যে হারে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয়, ঠিক সেই একই হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন বৃদ্ধির এই প্রবণতাকে সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলা হয়। এক্ষেত্রে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন খরচ সর্বদা একই থাকে এবং বিক্রেতা একই দামে অতিরিক্ত উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করতে পারে। সাধারণত এবং যে সব শিল্পে অধিক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত শ্রমিক এবং কাঁচামাল পর্যাপ্ত, একই দামে পাওয়া যায় সেসব ক্ষেত্রে এ বিধি প্রযোজ্য। এধরনের পরিস্থিতি বিরল। নিম্নে একটি তালিকার সাহায্যে সমানুপাতিক উৎপাদন বিধিটি ব্যাখ্যা করা হ'ল ঃ

তালিকা

শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপাদন	গড় উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১০০.০০	১০ কুইন্টাল	১০ কুইন্টাল	১০ কুইন্টাল
২০০.০০	২০ ”	১০ ”	১০ ”
৩০০.০০	৩০ ”	১০ ”	১০ ”
৪০০.০০	৪০ ”	১০ ”	১০ ”

তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম যখন ১০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয়, তখন মোট উৎপাদন ১০ কুইন্টাল। গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনও ১০ কুইন্টাল। দ্বিতীয়বার যখন ২০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয়, তখন মোট উৎপাদন হয় ২০ কুইন্টাল কিন্তু গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন থেকে যায় ১০ কুইন্টাল। তৃতীয়বার ৩০০ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয়, তখন মোট উৎপাদন হয় ৩০ কুইন্টাল। গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন আগের মতোই ১০ কুইন্টাল থেকে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে ঐ একই

হারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার সমানুপাতিক। এজন্য এরূপ অবস্থাকে সমানুপাতিক উৎপাদন বিধি বলা হয়। নিম্নে একটি রেখা চিত্রের সাহায্যে সমানুপাতিক উৎপাদন বিধিটি ব্যাখ্যা করা হল :

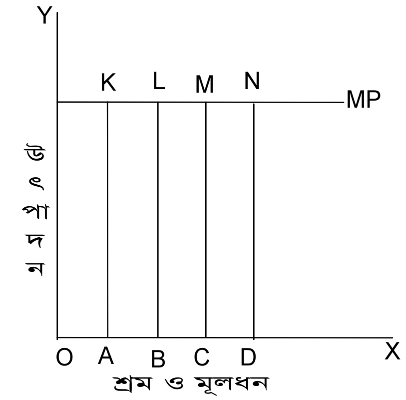

উপরের OX চিত্রে অক্ষে শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ এবং OY অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশ করে। চিত্রে MP হল প্রান্তিক উৎপাদন রেখা। যখন প্রথম একক OA পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয় তখন প্রান্তিক উৎপাদন রেখা AK, যখন দ্বিতীয় একক অর্থাৎ AB পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয় তখন প্রান্তিক উৎপাদন হল BL, যখন তৃতীয় একক অর্থাৎ BC পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয় তখন প্রান্তিক উৎপাদন রেখা CM। এরূপ চতুর্থ এককে প্রান্তিক উৎপাদন দাঁড়ায় DN। উৎপাদনের সকল স্তরেই প্রান্তিক উৎপাদন অর্থাৎ AK, BL, CM & DN পরস্পর সমান। এমতাবস্থায়, প্রান্তিক উৎপাদন রেখাটি ভূমির সাথে সমান্তরাল হয়। অর্থাৎ উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলেও প্রান্তিক উৎপাদন সমানুপাতিক হারে বাড়ছে। এটাই সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি।

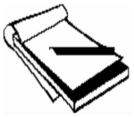

অনুশীলনী ৮.১

১. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি সমালোচনাসহ বর্ণনা করুন।
২. ক্রমবর্ধমান ও সমানুপাতিক উৎপাদন বিধিসমূহ বর্ণনা করুন।